বাঙ্গালার ইতিহাস।

তৃতীয় ভাগ।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

———:*:———

চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১০ সাল

মূল্য ৷৷০ আনা।৩

বিজ্ঞাপন।

"বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম ভাগ, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসনকাল পর্য্যন্ত, ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন বিরচিত। উহার দ্বিতীয় ভাগ ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। তাহাতে লর্ড বেণ্টিকের শাসনকাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায়।

তৎপরবর্ত্তিকালের ইতিহাস যাহা পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১২৭২সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে শিক্ষাদর্পণে লিখিতে আরম্ভ করেন ও যাহার কিয়দংশ একসময়ে এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়ায় বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগ নাম দেওয়া গেল। গ্রন্থকার যে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য সংশোধন করিয়া যাইতে পারেন নাই এবং ছোটলাট বীডন সাহেবের পরবর্ত্তিকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক যে সকল ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যাঁন নাই—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয়।

আশ্বিন
১৩১০।

প্রকাশক—

বাঙ্গালার ইতিহাস

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়

স্যর চার্লস মেট্‌কাফ্‌।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে মেট্‌কাফ্‌ সাহেবের হস্তে আপনার কার্য্যভার প্রদান করিয়া ঐ দিন স্বদেশে যাত্রা করেন। মেট্‌কাফ্‌ সাহেব কৌন্সেলের প্রধান মেম্বর এবং আগ্রার গবর্ণর ছিলেন। তিনি পাকা গবর্ণর জেনেরেল নিযুক্ত হয়েন নাই। কোর্ট অফ ডাইরেক্টরেরা তাঁহাকে মনোনীত করেন, কিন্তু ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভা হইতে এই উক্ত হয় যে, গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যে একজন ইংলণ্ডীয় প্রধান রাজনৈতিকের নিয়োগই সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। ডাইরেক্টরেরা আপত্তি করেন যে, তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে একেবারে বাদ দেওয়া উচিত হয়। সর্ব্বাংশে উপযুক্ত লোক দেশ হইতেই পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক লর্ড হেটেসবরি গবর্ণর জেনেরেল নিযুক্ত হইলেন কিন্তু তিনি ইংলণ্ড হইতে রওনা হইবার পূর্ব্বেই মন্ত্রী পরিবর্ত্ত হওয়ায় তাঁহার চাকরী গেল এবং এই স্থির হইল যে, বেণ্টিক সাহেব বিলাতে পৌঁছিলে একজন পাকা গবর্ণর জেনেরেল নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রী সভার পরিবর্ত্তন ও ইংলণ্ডের দলাদলির

উপর গবর্ণর জেনেরেলের নিয়োগ নির্ভর করা উচিত নয় বলিয়া ডাইরেক্টরেরা ও বন্দোবস্তে আপত্তি করেন। সে যাহা হউক গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যের ভার পাওয়া অবধি, অপর কোন ব্যক্তি ইংলণ্ড হইতে গবর্ণর হইয়া আসিবেন, মেটকাফ্ সাহেবকে নিরন্তর এই প্রতীক্ষায় থাকিতে হইয়াছিল *। কর্ম্মচারীদিগের মন ওরূপ অবস্থাপন্ন থাকিলে প্রায়ই তাঁহাদিগের দ্বারা কোন বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। স্বল্প দিনের নিমিত্ত যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়, সেই কার্য্যের প্রতি মমতা জন্মে না এবং তাহাতে সঙ্কুচিত ভাবে আপনার অভিমত চালাইতে হয়। কিন্তু তাহা হইলেও মেটকাফ্ সাহেবের অধিকারকালে কয়েকটি অতি প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। এরূপ হইবার প্রকৃত কারণ নিশ্চয় করিতে হইলে, ঐ সময়ে রাজ্যের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহা একবার পর্য্যালোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক্ষণে কেবল মাত্র বণিক্ সম্প্রদায় ছিলেন না, তাঁহারা যে কেবলমাত্র বাদসাহ প্রদত্ত দেওয়ানিরই যে অধিকারী ছিলেন তাহাও নয়; এক্ষণে সমস্ত ভারতবর্ষের অধিক ভাগই তাঁহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল। তাঁহাদিগের সৈন্যসংখ্যা ২ লক্ষের অধিক, প্রজাসংখ্যা ৯ কোটির অধিক, ভূমির খাজনা ৭ কোটি টাকার অধিক, লবণ-বাণিজ্য দ্বারা বার্ষিক লাভ ১ কোটি ৬০ লক্ষের অধিক; মাস্থলের দ্বারা আদায় ৩৯ লক্ষের অধিক এবং আফিম ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয়াদি নানা উপায়দ্বারাও প্রায় দুই কোটি টাকার অধিক আয় হইয়াছিল †। এমত অবস্থায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর নিতান্ত ব্যবসায়ী বণিক্ সম্প্রদায়ের ন্যায় থাকিয়া আপনাদিগের রাজকার্য্য চালাইতে পারেন না। বিশেষতঃ নূতন চার্টারের নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের বাণিজ্যকার্য্য রহিত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা আপনাদিগের কুঠী সমস্ত বিক্রীত করিতেছিলেন, এদেশে ইউরোপীয়েরা অবাধে বাস করিতে পাইবেন এমত অনুমতি হইয়াছিল, আর ইউরোপীয় এবং এত-

* কুরিয়র।

† ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

দেশীয় বলিয়া প্রভেদ করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার বিধিও রহিত হইয়া গিয়াছিল। ফলতঃ এই সকল অবস্থাগত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত এবং ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের অনুজ্ঞানুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদিম বণিক্ প্রকৃতির অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে রাজোচিত ব্যবহার করিবার নিমিত্ত একান্ত বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যবসায়ী লোকদিগের মন অর্থোপার্জ্জনের দিকেই ধাবমান হয়—রাজা আপন প্রজাবর্গের অনুরাগ ভাজন হইবার নিমিত্ত চেষ্টা না করিলে স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করিতে পারেন না। প্রজার প্রতি রাজার করণীয় প্রধানতঃ দুই।—এক, পরকীয় উপদ্রব নিবারণ। দ্বিতীয়, অন্তর্ব্বিবাদের হেতুভূত যাবৎ দোষের নিরাকরণ। ওয়ারেন হেষ্টিংস, ওয়েলেসলী এবং লর্ড ময়রা প্রভৃতি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণরেরা ক্রমে ক্রমে কি মুসলমান, কি হিন্দু, সকল স্বাধীন রাজাকেই আপনাদিগের পরাক্রম দেখাইয়া ইংরাজদিগের সমস্ত অধিকারকে উপদ্রবশূন্য করিয়া গিয়াছিলেন। বেণ্টিক সাহেবের সময়ে আর কোন প্রবল প্রতিপক্ষ উপস্থিত ছিল না। যে এক রণজিৎ সিংহ ছিলেন, তাঁহার সহিত গবর্ণমেণ্টের স্থির সৌহার্দ্দই ছিল।

অতএব ঐ সময়ে প্রজাবর্গের সাক্ষাৎ শুভানুধ্যান করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবেই আবশ্যক হইয়াছিল। রাজ্যশাসন যে প্রজাব্যূহের উপকারার্থেই হওয়া উচিত, ইহা আবার বহুকালের পর ঐ সময় হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে শুনা যাইতে লাগিল। ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজোচিত কার্য্যের অধিকাংশই বেণ্টিক সাহেবের সময়ে প্রবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। লর্ড ময়রা এদেশে একটী ইংরাজী কলেজ * সংস্থাপিত করেন। বেণ্টিক সাহেবের সময়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬টী কলেজ এবং স্কুলে ইংরাজী ভাষা অধ্যাপিত হইতেছিল †। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় হইতে এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকার্য্যচ্যুত এবং ইংরাজ কর্ম্মকরা সমস্ত নিযুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। পরে কর্ণওয়ালিসের সময়ে কোন বাঙ্গালীর

* হিন্দু কলেজ।
† আদম সাহেবের রিপোর্ট।

হস্তেই আর কোন বিশেষ কার্য্যভার থাকে না। বেণ্টিঙ্কের সময় হইতে আবার এতদ্দেশীয় লোকেরা বিচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন *।

বেণ্টিঙ্ক সাহেব ইহাও বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, প্রজাবর্গের উপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্য প্রকৃতরূপে সফল করিতে হইলে তাহাদিগের অভিমত জানিবার নিমিত্ত সম্যক্ উপায় বিধান করা আবশ্যক। কিন্তু যে দেশের শাসন-কার্য্য প্রতিনিধি সভা ভিন্ন অন্যরূপে সম্পন্ন হয়, তথায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বই প্রজাদিগের অভিমত জানিবার উপায়ান্তর থাকে না। এই ভাবিয়া তিনি আইনের দ্বারা না করুন, কিন্তু কার্য্যতঃ মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারের পূর্ব্বে এখানকার মুদ্রা যন্ত্র স্বাধীন ছিল না। এমন কি, ১৮২৩ সালে বকিংহাম সাহেব একখান ইংরাজী সংবাদ পত্রে গবর্ণমেণ্টের দোষ লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল; এবং সেই কার্য্যে ইংলণ্ডীয় কোন কোন রাজমন্ত্রীও অনুমোদন করিয়াছিলেন †। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক সাহেবের সময়ে হিন্দুদিগের চির-প্রচলিত সহমরণ প্রথার এবং ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের অনেক প্রকার দৌরাত্ম্যের নিবারণ হয় এবং তজ্জন্য কি বাঙ্গালা কি ইংরাজী অনেকগুলি সংবাদপত্রেই বেণ্টিঙ্ক সাহেবের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ প্রকাশ হইয়াছিল; তথাপি বেণ্টিঙ্ক সাহেব উহাদিগের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ভারতবর্ষের শাসন কার্য্য এই নূতন প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত হইবার পরই মেট্‌কাফ্ সাহেব এখানকার গবর্ণর জেনেরল হইলেন। কোন নূতন প্রণালীর অনুসারে কার্য্যারম্ভ হইলে কিছুকাল তাহার বল অধিক থাকে। এই জন্য মেট্‌কাফ্ সাহেবের কার্য্য সমস্ত বেণ্টিঙ্ক সাহেবেরই কার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিল এবং তাহা কিঞ্চিৎ শীঘ্র শীঘ্রও সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি এদেশে মুদ্রা-যন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংস্থাপিত করিলেন ‡। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীন হইয়া উঠিলেই লেখা পড়ার চর্চ্চা

* ১৮৩১ সালের ৫ম এবং ৩৩ সালের ৯ম আইন।
† কাইব্ হৌস প্লট।
‡ ১৮৩৫ সালের ১১ আইন।

অধিক হইবে এবং লেখা পড়ার চর্চা বৃদ্ধি পাইলেই এদেশীয় লোকেরা স্বয়ং হিতাহিত বিবেচনায় সমর্থ হইবে এবং সুতরাং স্বাধীন হইতে চাহিবে। উদারমতি মেট্‌কাফ্‌ সাহেব সে কথায় এই উত্তর করিয়াছিলেন যে, "যদি এদেশীয় লোকদিগের হিতাহিত জ্ঞান জন্মিলেই তাহারা আমাদিগের প্রতিকূল হয়, তবে এই অধিকার যত শীঘ্র আমাদিগের হস্তবহির্ভূত হয় ততই মঙ্গল"*।

মেটকাফ্‌ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাবৃদ্ধির এরূপ একান্ত পক্ষপাতী হইয়া অনায়াসেই নিশ্চয় করিতে পারিলেন যে, কলেজ এবং স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা করাইয়া আদালতে পারস্য ভাষার ব্যবহার প্রচলিত রাখা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ পরকীয় ভাষায় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে প্রজাগণ কখনই সুখী হয় না; প্রত্যুত উহাই তাহাদিগের পরাধীনতার জাজ্জল্যমান চিহ্ন স্বরূপ হইয়া অবমাননা-জনক হয়। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পারস্য ভাষার ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া আদালতে দেশীয় ভাষার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্যোগ করিলেন †।

আদালতে পারস্য ভাষা রহিত হইলে মুসলমানাধিকারের একটি চিহ্ন নষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হইবার নহে। মুসলমানাধিকারের অপর একটি চিহ্ন এই সময়ে একবারেই বিলুপ্ত হইল। সাহ আলম বাদশাহের নামাঙ্কিত সিক্কা টাকা উঠাইয়া ঐ সময় হইতে ইংলণ্ডাধিপতি ৪র্থ উইলিয়মের নামাঙ্কিত কোম্পানির টাকা প্রচলিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এই সকল কার্য্য অপেক্ষা অন্তর্বাণিজ্য হইতে মাশুল উঠাইয়া দেওয়াই মেটকাফ্‌ সাহেবের অধিকার কালের প্রধান কীর্ত্তি। নবাবী আমল হইতে পণ্য দ্রব্যাদির প্রতি অযথা শুল্কগ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কোন একস্থানের দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হইলে অগ্রে মাশুল দিয়া রোয়ানা বা ছাড় লইতে হইত। এক স্থানের ছাড় লইলেও চলিত না। পথের মধ্যে যতগুলি লইবার স্থান থাকিত সর্ব্বত্র ঐ ছাড়

---

* ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

† সাগর নর্ম্মদা প্রদেশ হইতে উহা প্রথম উঠিয়া যায়।

দেখাইতে হইত এবং সেই সুযোগে পুলিস কর্ম্মচারীরা মহাজন দিগের স্থানে উৎকোচ লইবার উপায় করিত। এইরূপ প্রতিবন্ধক সকল থাকিলে কখনই বণিক্‌বৃত্তির সুবিধা হইতে পারে না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা বিলক্ষণ জানিতেন এবং আপনারা ঐ মাসুলের দায় হইতে মুক্ত থাকিয়া অপরাপর বণিক্‌গণকে সেই দায়ের অধীন রাখিবার নিমিত্ত নবাবী আমলে অনেকবার অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে তাঁহারা দেশের রাজা হইলেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট সভাও তাঁহাদিগের বণিক্ বৃত্তি রহিত করিয়া দিলেন। সুতরাং এক্ষণে ঐরূপ মাসুল লইবার প্রথা উঠাইয়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক বোধ হইল। মেটকাফ্ সাহেব মাসুল উঠাইবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে রস্ সাহেব আগ্রার গবর্ণর ছিলেন। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আপনার অধিকার হইতে মাসুল লইবার প্রথা উঠাইয়া দিলেন। অনন্তর বাঙ্গলা হইতেও মাসুল লওয়া উঠিয়া গেল *।

মেটকাফ্ সাহেবের অধিকারের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ উল্লিখিত হইল। ঐ সময়ে দেশের এবং সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহাও সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। ১৮৩৫ | ৩৬ সালে সমুদায় ভারতবর্ষের বাণিজ্য পরিমাণ ১৫ কোটি টাকা হইয়াছিল; তন্মধ্যে কলিকাতায় আমদানি ৩ কোটি ১৫ লক্ষ এবং রপ্তানি ৫ কোটি ৭৩ লক্ষের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছিল। ঐ বৎসরই তিসির রপ্তানি প্রথম আরম্ভ হয়। একজন সাহেব ৭০ হাজার টাকার তিসি ইংলণ্ডে পাঠাইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন †। কৃষিবৃদ্ধির বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের ঐসময়ে বিশিষ্ট মনোযোগ হইয়াছিল। আসাম প্রদেশে চা-চাষের প্রথম সূত্রপাত করা হয়। আরাকান্ প্রদেশে হাবেনা-

* লর্ড কর্ণওয়ালিস একবার উঠাইয়াছিলেন, কিন্তু ১৮০১ সালে ওয়েলেসলি সাহেব পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেন। হোল্ট মেকেঞ্জি এবং ট্রেবিলিয়ন সাহেবদিগের প্রণীত পুস্তিকা।

† বেল সাহেবের কম্প্যারাটিভ রিভিউ।

অতি উৎকৃষ্ট তামাকের তুল্য তামাক উৎপন্ন করা হয়। আথড়ায় তুলার চাষ করাইয়া গবর্ণমেণ্ট সপ্রমাণ করেন যে, এক প্রকার মার্কিন তুলাও এদেশে অতি উত্তম জন্মিতে পারে *। ফলতঃ এদেশে কৃষি কার্য্যের সম্যক্ উন্নতি হয়, এমত একটি ইচ্ছা যে ঐ সময়ে বিশিষ্টরূপে প্রবল হইয়াছিল তাহার ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐ সময়ের প্রধান প্রধান বাঙ্গালী এবং "এদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারী বে-সর-" ইংরাজদিগের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার একটী প্রমাণ যে,দেওয়ানী মোকদ্দমায় ইংরাজদিগকে কোম্পানির আদালত সকলের অধীন করিবার অভিপ্রায়ে ঐ সময়ে যে একটী ব্যবস্থার † পাণ্ডুলিপি প্রচারিত হয় তাহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজেরাও যেমন বিরক্তি প্রকাশ করেন সেই সময়ের প্রধান প্রধান বাঙ্গালীরাও ‡ সেইরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর একটী প্রমাণ এই যে নীলকর দিগের পক্ষপাতী কোন কোন আইন § রহিত করিবার নিমিত্ত ডিরেক্টর সাহেবেরা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছিলেন ; এখানকার গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হন নাই ; সেই সময়ের কোন বাঙ্গালী বাবুও তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান্তরে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, নীলকর সাহেবেরা রাইয়ত দিগের বিরুদ্ধে নালিস করিলে তাহার বিচার দেওয়ানী আদালতে না হইয়া মাজিষ্ট্রেট দিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইবে, এবং মাজিষ্ট্রেটেরা যে বিচার করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে, এমত অভিপ্রায়ে যে একটী ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রচারিত হইয়াছিল, বাঙ্গালীরা তাহাতেও মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ তখনকার কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরাও আপনাদিগের দেশের ভাল মন্দ কিসে হইবে তাহা আপনারা বিচার করিয়া বুঝিতেন না। উহাঁরা

---

* এগ্রিকাল্‌চুরাল সৌসাইটীর রিপোর্ট।

† মেকলে সাহেবের কৃত প্রথম ব্লাক আক্ট।

‡ টৌনহলে উকীল টর্টন সাহেব এবং বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির বক্তৃতা।

১৮১৯ সালের ৭ আইনের ৫ম এবং ১৮৩০ সালের ৩ ও ৫ আইনের ২ এবং ধারা।

ইংরাজ দিগেরই নিতান্ত অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহা দিগের প্রতি কোন বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ইংরাজ এবং বাঙ্গালী যে কখন পরস্পর তুল্য পক্ষ বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে, তখন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তখন গবর্ণমেণ্ট যে ঐ উভয় প্রকার প্রজার মধ্যে কি পর্য্যন্ত প্রভেদ করিয়া চলিতেন তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাই বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়। তখন ২৪ পরগণায় যে চৌকীদারী টাক্সো আদায় হইত তাহা কেবল বাঙ্গালীরাই দিতেন, উহ কোন ইংরাজ অধিবাসীকে দিতে হইত না *।

তখনকার বাঙ্গালী জমিদারেরাও সাতিশয় হীনদশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন †। তখন জমিদারীর দর এত ন্যূন হইয়া ছিল যে, পাঁচ সনের মাল গুজারীই তাহার সর্ব্বোচ্চ মূল্য হইত। কোন কোন স্থানে এক বৎসরের খাজন মাত্র পণ পাইয়াও জমীদার আপন অধিকার বিক্রীত করিয়াছিলেন পুলিসের বন্দোবস্তও অতিশয় জঘন্য ছিল। সর্ব্বদাই চুরি ডাকাইতি হইত। বাঙ্গালীদিগের কথা দূরে থাকুক, সাহেবদিগের কুঠীতেও মধ্যে মধ্যে ডাকাইতি হইত। পুলিস তাহার নিবারণ করিতে পারিত না উহারা নিবারণ করিবে কি? আপনারাই প্রজাবর্গের যথেষ্ট উৎপীড়ন করিত। ঐ সময়ের কোন পুলিস দারগা আপন পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে "পরওয়ানা বাহির করিয়া" নিজ অধিকার হইতে সাত হাজার টাকা চাঁদ লইয়াছিলেন!

মফস্বলের অবস্থা এইরূপ; কিন্তু কলিকাতার অবস্থা ইহা অপেক্ষ অনেক ভাল ছিল। ইউরোপীয় এবং মার্কিণ বণিক্‌বর্গের মুৎসুদ্দি হইয় ঐ সময়ে কলিকাতায় অনেকে বিষয়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সকল লোকে উপর ইংরাজ দিগের যৎপরোনাস্তি প্রভাব ছিল। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় কৃতবিদ

---

* ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

† ১৮৩৫ সালের ৮ আইন।

‡ ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া—

ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হয় নাই ; আর যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্ভুক্ত হন নাই,—তাঁহারাও তৎকালে শ্রীবৃদ্ধিকারী ইউরোপীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ছিলেন।

এইরূপে নব্যমতাবলম্বী স্বল্পসংখ্যক বাঙ্গালীরা তৎকালে আপনাদিগের কোন স্বাধীন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। বিশেষতঃ অত্যল্প কাল পূর্ব্বেই সহমরণ নিবারণ লইয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রাচীন মতানুগামী স্বদেশীয় লোকদিগের বিলক্ষণ বিবাদ হইয়া গিয়াছিল। ঐ বিবাদ প্রযুক্ত তাঁহারা যে স্বদেশীয়দিগের প্রতি অবশ্যই কিঞ্চিৎ মমতা-শূন্য হইয়াছিলেন এবং ইংরাজদিগের বিশিষ্ট পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, ইহাও সহজে অনুমিত হইতে পারে। পরকীয় সহায়তায় সামাজিক দোষ নিবারণ করিতে গেলেই তাহার ফল এইপ্রকার হইয়া থাকে। প্রাচীন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে কখনই রাজনৈতিক সজীবতার কোন বাহ্য লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। অনুমরণ নিবারণ লইয়া যখন তুমুল আন্দোলন হয় তখন একবার মাত্র তাঁহারা কিঞ্চিৎ সচেষ্টের ন্যায় হইয়া ধর্ম্মসভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কতিপয় বর্ষ মধ্যেই ঐ সভা নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। উহার প্রধান প্রধান সভ্যেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কেহ কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া পতিত ব্যক্তিদিগের সমন্বয় করিবার চেষ্টাও করিতেছিলেন, এবং পরিশেষে আপনাদিগের কোন কোন অভিপ্রায়-সিদ্ধির নিমিত্ত নিতান্ত দীনবৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনাও করিতেছিলেন।

ফলতঃ বঙ্গদেশীয় লোকদিগের এই সময়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতি জন্মে না। প্রাচীন দল হতশক্তি হইয়া গিয়াছেন, নব্য দল সমুন্নত হন নাই, গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপেই স্বজাতীয় পক্ষপাতী রহিয়াছেন, পুলিসের লোকেরা ডাকাইতের অপেক্ষাও সমধিক দুর্বৃত্ত রহিয়াছে, ভূমি-সম্পত্তি মূল্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে, বাণিজ্য দ্বারা রাজধানীতে অর্থাগম হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই অর্থ সুপ্রীমকোর্টের মোকদ্দমায় অথবা অলীক আমোদ প্রমোদেই ব্যয়িত হইতেছে। এইরূপ দুর্লক্ষণ সমস্ত সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়।

মেট্‌কাফ্‌ সাহেবের অধিকার সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন বাঙ্গালী কলিকাতার অনরেরী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, কলিকাতায় সাধারণ পুস্তকাগার সংস্থাপিত হইয়াছিল, রবর্টসন সাহেব প্রথম ব্যোমযানে উঠেন, ৩৫ সালের ৮ই অক্টোবর ঝটিকার উৎপাত হয় এবং ৩৫ সালের ৩১শে আগষ্ট রাত্রি ৩টা ৪০ মিনিটের সময় মান্দ্রাজে হেলীর ধূমকেতু দৃষ্ট হয়।

লর্ড অক্‌লণ্ড।

১৮৩৬ সালের ১১ই মার্চ্চ তারিখে লর্ড অক্‌লণ্ড বাহাদুর মেটকাফ্‌ সাহেবের হস্ত হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অক্‌লণ্ড সাহেব অতি শান্তশীল সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। উদ্ভিজ্জতত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ বিদ্যার অনুশীলনে তাঁহার বিশিষ্ট আমোদ ছিল। তিনি বিলাত হইতে আসিবার সময় বিবিধ প্রকার বৃক্ষবীজ এবং চারা (১) লইয়া আসিয়াছিলেন; তাহার কতক কোম্পানির বাগানে দেওয়া হয় এবং কতক লইয়া বড় সাহেবের বাটীর দক্ষিণে যে রমণীয় বাগান এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই বাগানের প্রথম সূত্রপাত করা হয়। ফলতঃ অক্‌লণ্ড বাহাদুর যতদিন এদেশে ছিলেন, অবকাশ পাইলেই প্রধান প্রধান পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতদিগকে (২) লইয়া তাঁহাদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন এবং পদার্থবিদ্যাঘটিত চিত্তচমৎকরণীয় পরীক্ষা-বিধান সমস্ত দর্শন করিতেন। এইরূপ কার্য্যে তাঁহার যেমন আমোদ হইত, বোধ হয় অন্য কোন কার্য্যেই তেমন আমোদ হইত না।

নূতন চার্টরের নিয়মানুসারে গবর্ণর জেনারেলের প্রতি সমুদায় ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব এবং ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার সমর্পিত ছিল। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে একাকী (অর্থাৎ কৌন্সিলের সাহায্য ব্যতীত) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত (৩) এইরূপ গুরুতর কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়া অক্‌লণ্ড বাহাদুর প্রথমতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত

(১) সারসাপারিলা, ডানিলাং জলাপা, কোয়েসিয়া, লরেল প্রভৃতি।
(২) ডাক্তর ওসাগনেসী, কাপ্তেন বাইলো প্রভৃতি।
(৩) মেলবিল সাহেবের প্রণীত পুস্তিকা।

মঙ্গলকর বিষয়েই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে যে সকল কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ দ্বারাই উহাঁর সদাশয়তার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি মাসুল লইবার রীতির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়া মেটকাফ সাহেবের প্রবর্ত্তিত কার্য্যে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন (৪)—নগর সমস্তের স্বাস্থ্য এবং শোভা-সম্বর্দ্ধন করাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন (৫) পুলিসের দোষ সংশোধন করিবার জন্য বিশিষ্ট প্রয়াস পাইলেন (৬) বাজেয়াপ্তি লাখরাজ মহলের জরিপ করিবার নিমিত্ত আমীন নিযুক্ত করিলেন—কার্য্যসচিব-দিগের গুণের পুরস্কার এবং দোষের তিরস্কার করিবার অভিপ্রায়ে বেণ্টিক সাহেব যে সাংবৎসরিক রিপোর্ট গ্রহণের প্রস্তাব করিয়া যান, অক্লণ্ড বাহাদুর সেই প্রস্তাবানুসারে কার্য্যারম্ভ করিলেন এবং সুপ্রীমকোর্টের খরচা কমাইবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান এবং অনুরোধ করিয়া ঐ বিচা-রালয়ের খরচা শতকরা অশীতি টাকার হিসাবে ন্যূন করিয়া দিলেন। অক্লণ্ডের অধিকার কালের প্রথম বৎসরেই পোষ্ট আফিসের নূতন আইন প্রচারিত হইয়া সমুদায় সাম্রাজ্যে এক নিয়মে ডাক চলিতে লাগিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষায় ডাকের মাসুলও কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া গেল। অপ্রাপ্ত-ব্যবহার প্রধান প্রধান জমিদারদিগের শিক্ষা এবং তাঁহাদের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়েও তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে ঐ বালক বালিকাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বাদির অভিমত গ্রহণ করিয়া রেবিনিউ বোর্ড তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন, তদ্বিষয়ে বলপ্রকাশ করি-বেন না।

ঐ সময়ে প্রতি জেলার লোকসংখ্যা, দরিদ্রদিগের অবস্থা, মজুরির বেতন, অপরাধের হেতু, জন্ম মৃত্যু বিবাহাদির তালিকা, সন্তানোৎপত্তির সংখ্যা প্রভৃতি রাজার অবশ্যজ্ঞাতব্য ঐতিবৃত্তিক বিবরণের অনুসন্ধান

(৪) ১৮৩৬ সালের এপ্রিল মাসে টৌন্ ডিউটি উঠিয়া যায়।

(৫) মেক্নাটেন্ সাহেবের পত্র।

(৬) হেলিডে সাহেবের পুলিস রিপোর্ট।

করিবার জন্য কমিশনর এবং অপরাপর কর্ম্মকরদিগের প্রতি ভার দেওয়া হয় (৭) জেল সকলে কয়েদীদিগের সমধিক পীড়া এবং মৃত্যু ঘটনা শতকরা ৫৭ জনের অধিক হইয়া থাকে বলিয়া যে প্রবাদ উঠিয়াছিল ঐ সময়ে তাহার অসত্যতা সপ্রমাণ করা হয় (৮) অধিকন্তু, ঐ সময়ে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বাস্পীয় পোত দ্বারা সংযোগ হইবার উপক্রম হইতেছিল, আর বেণ্টিক সাহেবের সময় অবধি গঙ্গানদীতে বাস্পীয়পোতের গতিবিধি হইতেছিল। বাস্পীয়পোতে লৌহের এবং কয়লার অনেক প্রয়োজন হয়। কিন্তু এদেশের কোথায় কিরূপ মৃদঙ্গার বা লৌহের খনি আছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। ১৮১৫।১৬ সালে জোন্সনামা একজন সাহেব শ্রীহট্টের সন্নিহিত একটি স্থানে মৃদঙ্গারের খনি প্রকাশ করেন, পরে বর্দ্ধমানের খনিও প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহাতেও লৌহের বা কয়লার মূল্য ন্যূন হয় নাই। অতএব অক্লণ্ড বাহাদুর কয়লা এবং লৌহের আকর কোথায় কিরূপ আছে তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটি কমিটী নিযুক্ত করিলেন (৯) অক্লণ্ড বাহাদুর ইহাও বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, মেডিকেল কলেজ সংস্থাপন দ্বারা এদেশে ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবেশ হওয়াতে ক্রমে ক্রমে দেশীয় চিকিৎসার হ্রাস এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ বিলোপ হইবারই সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে অবশ্যই এমত সকল ঔষধের উল্লেখ থাকিবে যাহা দ্বারা এদেশীয় বিবিধ রোগের বিশিষ্টরূপ প্রতিকার হইতে পারে। অতএব যাহাতে সেই সকল ঔষধ বিলুপ্ত না হয়, তজ্জন্য ঐ সময়েই চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি দেশীয় ঔষধ সমস্তের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আর একটি কমিটী নিযুক্ত (১০) করেন।

---

(৭) মেক্নাটন্ সাহেবের ১৮৩৭ সালের ২৫শে এপ্রিলের পত্র।

(৮) হচিন্সন্ এবং জেল কমিটীর সেক্রেটরী গ্রাণ্ট সাহেবের রিপোর্ট।

(৯) আইবন এবং কোল-কমিটীর মিনিট।

(১০) ড্রগ কমিটী বিষয়ক মিনিট।

উল্লিখিত হিতকর কার্য্য সমস্তে অক্‌লণ্ড বাহাদুরের প্রবৃত্তি দেখিলেই তাঁহার যে পরম কল্যাণকর বিদ্যালয় সমস্তের প্রতিও বিশিষ্ট অনুরাগ প্রকাশ হইবে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ফলতঃ অক্‌লণ্ড বাহাদুর এদেশে আসিবার কয়েক দিবস পরেই (১১) কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ খোলা হয় এবং ছয় মাস (১২) না হইতে হইতেই আবার হুগলী কলেজের কার্য্যারম্ভ হয়। তৎকালের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিবার সময় সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমারোহ করা হইত। লর্ড অক্‌লণ্ড প্রায়ই ঐ সকল কার্য্যস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ছাত্র এবং শিক্ষকবর্গের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতেন। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং এডুকেশন কমিটীর সভাপতি সার এডওয়ার্ড রাইয়েন সাহেবও ঐ সকল সময়ে লর্ড অক্‌লণ্ডের সহচর হইতেন।

কিন্তু লর্ড অক্‌লণ্ড বাহাদুর যদিও বিদ্যানুশীলনের পক্ষে এমত উৎসাহশীল ছিলেন এবং তাঁহার যত্নেই গবর্ণমেণ্ট হইতে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক টাকা (১৩) এই কার্য্যে ব্যয়িত হইতে আরম্ভ হয়, তথাপি তাঁহার সময়ে সরকারী শিক্ষাবিভাগের কার্য্য-প্রণালী বিশিষ্ট কোনরূপে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ঐ সময়ে শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতামত প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ বলিতেন যে, এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী করিলেই বিদ্যাধ্যাপন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, কেহ বলিতেন যে, ইউরোপীয় বিদ্যার সারভাগ সমস্ত সংস্কৃত এবং আরবী ভাষায় রূপান্তরিত না হইলে তাহা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর গ্রাহ্য হইবে না, অতএব যাহাতে সংস্কৃত এবং আরবী চর্চ্চা গবর্ণমেণ্ট কলেজ সকলে হইতে পায় এমত বিধান করা আবশ্যক। অপর অনেকে বলিতেন যে,

(১১) ৩০শে মার্চ্চ ১৮৩৬।

(১২) ১লা আগষ্ট ১৮৩৬।

(১৩) পূর্ব্বে এক লক্ষ টাকা খরচ হইত লর্ড অক্‌লণ্ডের সময় এডুকেশনের খরচ ২লক্ষ ৬০হাজার হয়।

ইংরাজী অথবা সংস্কৃতাদি ভাষার শিক্ষায় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় এবং সময়াতিপাত করিতে হয়, তাহা সাধারণ লোকের একান্ত সাধ্যাতীত;; অতএব ইংরাজি অথবা সংস্কৃতাদির চর্চ্চা করা নিষ্প্রয়োজন। যাহাতে বাঙ্গালা হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় লেখা পড়ার শিক্ষা বাহুল্য হয় তাহাই করা উচিত।

উল্লিখিত মতামতের বিষয়ে সর্ব্ববাদিসম্মত কোন মীমাংসা এখন পর্য্যন্তও অবধারিত হয় নাই। বোধ হয় ইহা সহজে হইবারও নহে। যাঁহারা কোন পরকীয় ভাষা জানেন, তাঁহারা উহা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত যে পরিশ্রম করেন তাহা পণ্ডশ্রম হইয়াছে এমত মনে করিতে না পারিয়া প্রায়ই উহার অযথা গৌরব করিয়া থাকেন; পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐ ভাষা জানেন না তাঁহারা আপনারা যাহা জানেন না সে বড় একটা কাজের জিনিস নহে এরূপ বিবেচনা করিতে অবশ্য ইচ্ছুক হইয়া থাকেন। এইরূপ উভয় পক্ষের অভিমানমূলক যে মতামত তাহার খণ্ডন হইয়া ঐক্যমত সংস্থাপিত হওয়া সুকঠিন। ফলতঃ এই বিষয়ের ইতিহাস যতই বিশিষ্টরূপে অনুসন্ধিত হইবে ততই দেখা যাইবে যে, যে সকল ইংরাজ সংস্কৃতাদি এতদ্দেশীয় প্রাচীন ভাষা কিছু কিছু জানিতেন;তাঁহারাই ঐ সকল ভাষার চর্চ্চা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেন, যাঁহারা বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশীয় প্রচলিত ভাষা বুঝিতেন তাঁহারা প্রচলিতভাষা শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিবার অনুরোধ করিতেন,আর যাঁহারা ঐ দুইয়ের কিছুই জানিতেন না তাঁহারা কেবল মাত্র ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াই বিধেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে দেখ, ইংরাজদিগের মধ্যে এ দেশীয় কোন ভাষা জানা থাকা লোকের অপেক্ষা তাহা না জানা থাকা লোকেরই সংখ্যা অধিক; সুতরাং এ দেশীয় শিক্ষা-প্রণালী যে ক্রমশঃ সেই অধিকতরসংখ্যক লোকের মতানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। লর্ড অকলণ্ড বাহাদুর যদিও উল্লিখিত ত্রিবিধ মতাবলম্বীদিগের সম্মান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি ইংরাজীর প্রতিই তাঁহার বিশিষ্ট পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছিল। ইংরাজী জানা লোকদিগকে বিশিষ্ট সমাদর

পূর্ব্বক রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে (১৪) তিনি এ প্রকার অভিমত প্রকাশ করেন এবং সেই অবধি যেমন চাকরীর লালসা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল তেমনি ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার প্রতিও লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। অক্‌লণ্ড বাহাদুর কলেজ এবং স্কুল সকলে ছাত্রবৃত্তির নিয়ম সংস্থাপিত করেন। তাঁহার সময়ে জেলায় জেলায় লোকাল কমিটি সংস্থাপিত হয়। এবং পরিশেষে কমিটী অব্ পব্লিক্ ইনষ্ট্রক্শন্ উঠিয়া গিয়া কৌন্সিল অব্ এডুকেশনের প্রতি বিদ্যাধ্যাপনীয় কার্য্যের ভার প্রদত্ত হয়। কিন্তু লর্ড অক্‌লণ্ডের সময়ে যদিও বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুল সংস্থাপিত হয় নাই, তথাপি ঐ সময়ে যে আর একটি মহত্তর কার্য্য করা হয়, তদ্দারায় এদেশীয়দিগের বিশিষ্ট মঙ্গল সূচনা এবং বাঙ্গালা ভাষার সম্যক্ গৌরব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট (১) এত দিনের পর স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিলেন যে, বিজাতীয় ফারসী ভাষার ব্যবহার রহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিজাতীয় ইংরাজীর চলন হইলে প্রজা সাধারণের পক্ষে কোন উপকার দর্শিবে না; অতএব দেশের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষাতেই সকল আদালতের লেখা পড়া চলিবে। বিশেষতঃ ঐ সময়ে আদালতের ভাষা বাঙ্গালা হওয়ার পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধকতাই ছিল না। দেশীয় বিচারপতিদিগের ক্ষমতা এবং বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়াতে সকল মোকদ্দমাই তাঁহাদিগের আদালতে সুরু হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সিবিলিয়ান জজেরা কেবলমাত্র আপীলের বিচার করিতেন। সুতরাং বিচারপতিগণ বাঙ্গালা ভাল বুঝিবেন না বলিয়া ইংরাজীর ব্যবহার প্রচলিত করিবারও কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। তদ্ভিন্ন, গবর্ণমেণ্ট গেজেটে (২) আইন সকলের অনুবাদ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হওয়াতে ও বাঙ্গালা ভাষার এবং বঙ্গদেশীয় প্রজাব্যূহের

(১৪) অক্‌লণ্ড সাহেবের এডুকেশন মিনেট ১৮৩৯ এবং রেভেনিউ বোর্ডের চিঠি ১৮৩৭।

(১) ১৮৩৭ সালের ২৫শে এপ্রিলের সরকুলর।

(২) ১লা জুলাই ১৮৪০ সাল।

বিশিষ্টরূপে গৌরব রক্ষা হইয়াছিল। এই সকল কার্য্য দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বেণ্টিক সাহেবের সময় হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে হিতকারী প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অক্‌লণ্ডের সময়েও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

কিন্তু অক্‌লণ্ডের সময়ে অনেক লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত হয় বলিয়া সেই সময়ে প্রজা সাধারণের অন্তঃকরণে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরাগ জন্মিয়াছিল। তখন অন্যূন আড়াই কোটী টাকা বার্ষিক খাজনা হইতে পারে এত ভূমি লাখেরাজ ছিল; এবং তন্মধ্যে অসিদ্ধ লাখেরাজও বিস্তর ছিল; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যে এত অধিক টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না তাহা সহজেই বোধ হইতে পারে। কিন্তু তদ্ভিন্ন, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং যে প্রকার বিলম্ব করিয়া ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইতেছিল, তজ্জন্যও লোকের সমূহ ক্ষতি এবং ক্লেশ জন্মিয়াছিল। অন্যূন ৪০ বৎসর ধরিয়া এই লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কখন বা ঐ কার্য্য সত্বর সম্পন্ন হইবে এমত সম্ভাবনা হইত, আবার কখন বা উহা একেবারে স্থগিত হইয়াই থাকিত—ইহাতেও জনগণের অন্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ ভয়ের উদ্রেক এবং পুনঃ পুনঃ আশা ভঙ্গ হইত। বিশেষতঃ লাখেরাজদারদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই একটী স্পষ্ট অন্যায়াচরণ করিয়া ছিলেন যে, উহারা যদিও এইরূপ মোকদ্দমায় বাস্তবিক প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিত, তথাপি উহাদিগকে তাহা হইতে না দিয়া বাদীর স্থানীয় করা হইয়াছিল। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট অগ্রে বিচার করিতেন না যে, অমুক লাখেরাজ সিদ্ধ কি অসিদ্ধ। উহা একবারেই বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত। পরে লাখেরাজদারদিগকে নালিশ করিয়া লাখেরাজ স্বত্ব প্রমাণ করিতে হইত। যাহা হউক, অক্‌লণ্ডের সময়ে অনেকগুলি ডেপুটী কালেক্টার নিযুক্ত হয়েন এবং লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত পূর্ব্বাপেক্ষায় সত্বরে সম্পন্ন হইতে আরম্ভ হয়।

এই কার্য্য এতদ্দেশীয় সকল লোকেরই মনোগত অভিপ্রায়ের নিতান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছিল। যদি অন্য সময়ে অথবা ইংরাজ ভিন্ন অপর কোন রাজার আমলে ইহা উপস্থিত হইত তবে জনগণের বিরাগ হয়ত মনে মনেই থাকিত, ভয়বাহুল্য এবং স্বাধীনতার অভাব বশতঃ তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না। কিন্তু ইংরাজদিগের সংসর্গাধীনে এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার রীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই শিক্ষার প্রথম শুভ ফল এই সময়েই উদ্গত হইল। কতিপয় বিজ্ঞ ইংরাজ এবং বাঙ্গালী জমীদার মিলিত হইয়া একটী সভা সংস্থাপিত করিলেন। সেই সভার প্রধানতম মুখ্য উদ্দেশ্য লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বন্ধ করা। উহার নাম ভূম্যধিকারী সভা (৩) কিন্তু এই সভার চেষ্টা আপাততঃ কোন বিশিষ্ট ফলোপধায়িনী হয় নাই (৪) বাজেয়াপ্তি কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষায় কিঞ্চিৎ সত্বরেই সম্পন্ন হইতে লাগিল এবং পরিশেষে অর্দ্ধেক মাল গুজারিতে অনেকানেক লাখেরাজদারের সহিত বন্দোবস্ত অবধারিত হইয়া গেল।

এই সময়ে কুলির বাণিজ্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত আর একটী মহতী সভা হয়। ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টের সবিশেষ চেষ্টায় দাস বাণিজ্য রহিত হইয়া অবধি ক্রমশঃ ভারতবর্ষীয় কুলি মজুরদিগকে প্রতি বৎসর সমধিক পরিমাণে ডেমারারা, জামেইকা, এবং মরিস্যস প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হইতেছিল। ঐ সকল লোকদিগকে জাহাজে উঠাইবার সময় নানা প্রকার প্ররোচনা প্রদান করা হইত, তন্মধ্যে ইহাও বলা হইত যে, তাহারা ছয় মাসের বেতন অগ্রিম পাইবে—কিন্তু সর্ব্বস্থলে কথানুরূপ কার্য্য করা হইত না। বিশেষতঃ কুলিদিগকে লইয়া যাইবার সময় জাহাজের মধ্যে তাহাদিগের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইত এবং পরে

(৩) হিন্দু কলেজে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের বক্তৃতা এবং উকীল থিওডোর ডিকেন্সের বক্তৃতা।

(৪) হেলিডে সাহেবের পত্র।

দ্বীপান্তরে উত্তীর্ণ হইলে তাহারা সকলেই যে সদয় এবং বিবেকশালী মনিব পাইত তাহাও নহে। সুতরাং অনেকেই নানা প্রকারে প্রপীড়িত হইত। এই সকল অত্যাচার কতকদূর নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট একটী আইন (৫) করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন বিশেষ উপকার দর্শে নাই। অতএব খৃষ্টধর্ম্ম পরায়ণ (৬) সদাশয় ব্যক্তিগণ অনেকে একত্রিত হইয়া কুলি-বাণিজ্য রহিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে আপাততঃ বিলক্ষণ ফল দর্শিল। কুলি বাণিজ্য কিছু কালের নিমিত্ত একেবারে রহিত হইয়া গেল (৭) ফলতঃ লর্ড অকলণ্ডের সময়ে এদেশে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল অথবা যে সকল কার্য্যের প্রথম সোপানে আরব্ধ হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের প্রকৃতি যতই অনুসন্ধান করা যায় ততই প্রতীত হয় যে, এই সময় হইতে এখানকার শাসন কার্য্যের সহিত ইংলণ্ডনিবাসীদিগের সাধারণ অভিমতের বিশিষ্ট সংস্রব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বেণ্টিকের সময় হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বণিক্-বৃত্তিপরাঙ্মুখ হইয়া রাজোচিত কার্য্যে প্রবর্ত্তমান হয়েন। অকলণ্ডের সময়ে ঐ রাজোচিত ব্যবহার ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের অনভিমত না হইয়া প্রত্যুত যাহাতে তাহাদিগের অনুমোদিত হয়, গবর্ণমেণ্ট যেন এইরূপ যত্ন পাইয়াছেন, ইহাই বোধ হইতে থাকে। বস্তুতঃ এরূপ হইবার বিশিষ্ট কারণও ঐ সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতি মাসেই বাষ্পীয়পোত যোগে ইংলণ্ড হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত ডাকের গতায়াত হইতেছিল। তাহাতে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক অনেক নিকটতর হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া জাহাজের গতিবিধি হইত। সুতরাং তখন ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের পরস্পর অন্তরতা ১৬ হাজার মাইল ছিল, এক্ষণে সুয়েজ যোজকের দ্বারা যাতায়াত আরম্ভ হওয়াতে ঐ অন্তরতা ৫ হাজার ৮ শত মাইল হইয়াছিল। তখন ছয় মাসে

(৫) ১২ আইন ১৮৩৭ সাল।

(৬) ১১ই জুলাই ১৮৩৮ সালে লর্ড বিশপের বক্তৃতা।

(৭) ১৪ আইন ১৮৩৯ সাল।

একখানি চিঠী আসিত, এক্ষণে প্রতি মাসে চিঠীর ডাক চলাতে অন্যূন ৩ লক্ষ ৯ হাজার চিঠীর যাতায়াত হইতেছিল (৮) তদ্ভিন্ন, এখানকার লোকেরা ইহার পূর্ব্বে ৫০ হাজার টাকার ন্যূন মূল্যের মোকদ্দমার আপীল প্রিবিকৌন্সিলে করিতে পারিতেন না, এক্ষণে ১০ হাজার টাকার মোকদ্দমার আপীলও প্রিবি কৌন্সিলে হইতে পারিত। সুতরাং ইহাঁরা পুনঃ পুনঃ প্রিবি কৌন্সিলের শরণ লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডনিবাসীরাও ভারতবর্ষের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষায় কিঞ্চিৎ অনুকূল দৃষ্টিপাত করত দুই একটী সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। (৯)

ইংলণ্ডীয়দিগের এরূপ দৃষ্টিপাত আরম্ভ হইলেই সুতরাং কেবলমাত্র লোভের অধীন হইয়া এখানকার গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যেগুলি জাতীয় ধর্ম্মশাসনের স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ তাহা ক্রমশঃ রহিত হইয়া যাইতে লাগিল। এদেশীয়দিগের তীর্থস্থান রক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তীর্থদর্শক যাত্রীদিগের স্থানে যে কর লইতেন এবং কর বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে কোথাও কোথাও যাত্রী যুটাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-সচিবেরা যে প্রকার যত্ন করিতেন, তাহা খৃষ্টধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া বোধ হওয়াতে পূর্ব্বে পূর্ব্বে ডিরেক্টরেরা ঐ কর উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত লিখিয়াছিলেন; কিন্তু এখানকার গবর্ণমেণ্টকে লিপ্যনুযায়ী কার্য্য করাইবার জন্য তাঁহারা এ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রয়াস পান নাই এবং গবর্ণমেণ্টও ঐ লিপ্যনুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট ব্যগ্র হয়েন নাই। এক্ষণে আর সেরূপ রহিল না। ইংলণ্ডের সহিত নৈকট্য সমুপস্থিত হওয়াতে এখানকার ইংরেজ কার্য্য-সচিবেরা পূর্ব্বাপেক্ষা জাতীয় ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন যে, তাঁহারা আর দেবালয়াদি রক্ষার বিষয়ে যত্ন করিবেন না, (১) এবং পরি-

(৮) লার্ড নর সাহেবের প্রণীত পুস্তিকা।

(৯) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী এবং আবরিজিনীস প্রোটেক্সন সোসাইটী।

(১) ১৮১৯ সালের ৩০ আইন। সদর বোর্ড মাঙ্গল সাহেবের মিনেট।

শেষে কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় দেবসেবা ব্যাপার হইতে একেবারেই নিঃসম্পর্ক হইলেন।

অক্‌লণ্ড বাহাদুরের সময়ে বাঙ্গালার মধ্যে যে সকল প্রধান প্রধান কার্য্য হইয়াছিল তাহা এক প্রকার কথিত হইল। ঐ সময়ে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত সিন্ধুপারবর্ত্তি কাবুল প্রদেশের অধিপতি দোস্ত মহম্মদের যে যুদ্ধ হয় এবং তাহাতে ইংরেজেরা প্রথমে বিজয়ী হইয়া পরে যে প্রকারে বঞ্চিত এবং পরাভূত হন, তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ঐ যুদ্ধকাণ্ড ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গের অভিমত্যানুসারেই হইয়াছিল; সুতরাং অক্‌লণ্ড বাহাদুর ঐ অন্যায্য কার্য্যের সম্পূর্ণ দোষভাগী হইতে পারেন না। (২) রুসিয়ারা প্রবল হইয়া পারস্য দেশাধিপতিকে আপনাদিগের অভিমতানুগামী করিয়াছিল। পাছে তাহারা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আপনাদিগের প্রভাব বিস্তার করে এই ভয় প্রযুক্তই ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট, উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয় কাবুল প্রদেশ আপনাদিগের আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা করেন। দোস্ত মহম্মদের সহিত যুদ্ধ করিবার এইমাত্র কারণ। কিন্তু অক্‌লণ্ডের সময়ে আর একটি যুদ্ধ কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল; তাহার স্থূল বিবরণ না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। ঐ যুদ্ধের ফলেই অদ্যাপি আফিমের বাণিজ্য দ্বারা বাঙ্গালা প্রদেশের রাজস্ব এত অধিক হইয়া রহিয়াছে। ঐ যুদ্ধ কাবুলের যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিক অন্যায্য এবং উহাও ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গের সর্ব্বতোভাবে অনুমোদিত হইয়াছিল (৩)।

ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনীয়দিগের নিকট এতদ্দেশজাত আফিম বিক্রয় করিতেন। ১৭৬৭ সালে বারশত টাকার অনধিক মূল্যে চীনীয়রা এক সিন্দুক মাত্র আফিম প্রথম ক্রয় করে। ক্রমে বর্ষে বর্ষে আফিমের বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। চীনীয় গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ সালে উহার প্রতি শুল্ক নিরূপণ করেন। ইংরাজেরা শুল্ক না দিয়া গুপ্ত ভাবে আফিম বিক্রয় করিবার

---

(২) কে সাহেবের প্রণীত আফগান যুদ্ধের বিবরণ।

(৩) ... অব ইণ্ডিয়া।

চেষ্টা পান। ১৭৯৯ সালে চীনীয় গবর্ণমেণ্ট আফিমের ব্যবসায় একেবারে রহিত করিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হয় না। গুপ্ত বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রবলতর রূপে চলিতে থাকে। ১৮১৭ সালে ৩ হাজার সিন্দুক এবং ১৮৩৭ সালে ৩৪ হাজার সিন্দুক আফিম বিক্রয় হয়। চীনীয় গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, যে, আফিম বাণিজ্য বলবৎ থাকিলে আর দেশের রক্ষা নাই। তৎকালেই অন্যূন সাড়ে বার কোটী চীনীয় লোক নিরন্তর আফিমের ধূমপান করত অকর্ম্মণ্য প্রায় হইয়া গিয়াছিল। অতএব চীন মহীপতির প্রধান কর্ম্মসচিব স্বদেশহিতৈষী লিন্ মহোদয় স্থির-প্রতিজ্ঞতা সহকারে এই সর্ব্বনাশক আফিম বাণিজ্যের মূলোচ্ছেদন করিবার নিমিত্ত, যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক আফিম বিক্রেতার প্রাণদণ্ড করিলেন, অনেক আফিম বাজেয়াপ্ত করিয়া জ্বালাইয়া দিলেন, ইংরেজদিগের সহিত একেবারে নিঃসম্পর্ক হইবার নিমিত্ত সমুদায় বাণিজ্য ব্যাপার রহিত করিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না। ইংরেজদিগের রণতরী সমস্ত তাঁহার তাবৎ আশা ভঙ্গ করিয়া অনিষ্টকর আফিম বাণিজ্যকে স্থায়ি ভাবাপন্ন করিল (৪)। ভবিষ্যতের কথা কেহই বলিতে পারে না—কিন্তু ধর্ম্ম যে সর্ব্বথা প্রবল হইতে পায় না, প্রত্যুত অধর্ম্ম অনেকানেক স্থলে বিজয় লাভ করে, এই চীনীয় যুদ্ধই তাহার একটি উত্তম উদাহরণ হইয়া রহিয়াছে।

উল্লিখিত দুইটী যুদ্ধ কার্য্য ভিন্ন অক্লণ্ডের সময়ে আরও একটী যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ অন্যায্য নহে। উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী গুমসর নামক স্থানে কতকগুলি অসভ্য খোন্দ নামধেয় বন্য লোক বাস করে। উহারা আপনাদিগের পরমারাধ্যা তারাপূর্ণা পৃথিবী দেবীর পূজা কালীন নরবলি প্রদান করিত (৫)। সেই নৃশংস ব্যবহার নিবারণ করিবার নিমিত্ত সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গুমসর প্রদেশটীকে আপনাদের আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

---

(৪) চাইনীজ রিপজিটরী।

(৫) কমিসানর রিকেটসের রিপোর্ট।

অকলণ্ডের সময়ে সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃ তাৎকালিক বাণিজ্যব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়। ১৮৪০। ৪১ সালের আমদানি ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ, রপ্তানি ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মদ্যের আমদানি সাড়ে ১০ লক্ষ অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষায় দেড় লক্ষ অধিক হইয়াছিল। কার্পাস বস্ত্রের রপ্তানি ১৮৩৫।৩৬ সালে ৮ লক্ষ ৮০ হাজার ছিল, উহা '৪০। ৪১ সালে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার হইয়া গিয়াছিল। কোরাপ্রভৃতি কৌষেয় বস্ত্রের রপ্তানি তখনও ন্যূন হয় নাই বটে কিন্তু তন্তুবায় এবং বিক্রেতৃগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন করিয়া কোরার বপন বা পরিষ্করণ সম্পাদন করিত না; বিশেষতঃ চিনি অথবা সোরা সংযুক্ত করিয়া বস্ত্রের ওজন বাড়াইবার চেষ্টা করিত। এই হেতু কোরার ব্যবসায়ও ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ উপক্রম হইয়াছিল। পরন্তু চিনির রপ্তানি ৩৫।৩৬ সালে ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার মণের অধিক ছিল না। ইহা ৪০।৪১ সালে ১৭ লক্ষ ৮৪ হাজার মণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া স্পষ্টই অনুভব করিতে পারা যায় যে, এদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাণিজ্য হ্রাস এবং কৃষি প্রসূত দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল (১)।

কৃষিকার্য্যের কোন বিশেষ ঔৎকর্ষ ঐ সময়ে প্রতীয়মান হয় না। এগ্রিকলচুরেল সোসাইটীর সভ্যেরা এদেশের কোচিনিল-পোকা জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন। আসাম প্রদেশে খদির জন্মাইবার চেষ্টাও সফল হয় নাই। তুলার চাস হইতে পারে কোন কোন স্থানে ইহা মাত্র প্রমাণ হইয়াছিল, কিন্তু ঐ চাসের তাদৃশ বৃদ্ধির কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় নাই। বস্তুতঃ এগ্রিকলচুরেল সোসাইটীর সভ্যেরা পারিতোষিক দিয়া এবং অন্যান্য নানা প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিয়া এতদ্দেশীয় জমীদার কি অপরাপর লোককে কৃষির উৎকর্ষ সাধনার্থ যত্নবান করিতে পারেন নাই। ১৮৩৭ সালে ৭ জন বাঙ্গালী ঐ সভার সভ্যশ্রেণীসম্ভুক্ত ছিলেন; কিন্তু ৩৯ সালে বাঙ্গালী সভ্যের সংখ্যা এক

(১) কাম্পবেল সাহেব প্রণীত কমর্সা'ল আসবাব।

জনের অধিক ছিল না। উল্লিখিত সোসাইটী বাঙ্গালা ভাষায় কৃষি বিষয়ক যে সকল পুস্তিকা মুদ্রিত করিতেন তাহার এক খণ্ডও কোন বাঙ্গালী ইচ্ছাতঃ ক্রয় করিতেন না। (২)

যখন জমীদার প্রভৃতি এতদ্দেশীয় আঢ্য ব্যক্তিরা কৃষি-কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে এরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন তখন যে, জমীদারীর অবস্থাও ভাল হইতে পারে না, ইহা সহজেই অনুমিত হইবে। ঐ সময়ে প্রায়ই জমীদারদিগের রাজস্বদানে অনেক বাকি পড়িত। এমন কি, ৩৬ সালের খাজনা আদায় ৩ কোটির স্থলে আড়াই কোটি টাকার বড় অধিক হয় নাই (৩) বাকী আদায়ের জন্য ঐ সময়ে কঠিনতর আইন বিধিবদ্ধ হয় (৪)।

এতদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত কি শ্রীবৃদ্ধিকারী, কি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মকর সকল প্রকার ইংরেজেরই বিশিষ্ট সদ্ভাবের অনেকানেক চিহ্ন এই সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও নীলকরেরা রাইয়তদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষায় বিশিষ্ট কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই এবং যদিও নীল চাসের দ্বারা রাইয়তদিগের প্রতি বিঘা ভূমিতে অন্যূন সাত সিকা করিয়া লোকসান হইতেছিল (৫) তথাপি প্রধান প্রধান বাঙ্গালীরা যেন তাহা জানিয়াও জানিতেন না এমত ভাবে চলিতেন, এবং নীলকর প্রভৃতি সাহেবদিগের দ্বারা এদেশে সমূহ উপকার হইতেছে ইহাই মুক্তকণ্ঠে বলিতেন (৬)। রাইয়তেরাও জানিত, অথবা সন্দেহ করিত যে, কমিস্যনর, জজ, মেজেষ্টর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইংরেজেরা অনেকেই নীলকুঠীর অংশীদার আছেন। সুতরাং নীল চাস করাতে যে লোকসান

(২) এগ্রিকলচুরেল সোসাইটীর রিপোর্ট।

(৩) পাটল সাহেবের মিনেট।

(৪) ১৮৪২ সালের সূর্য্যাস্তের আইন।

(৫) ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

(৬) দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাক্ষ্য।

হয় তাহা রাজপুরুষদিগের অভিপ্রেত। এই ভাবিয়া উহারাও মৌন ভাবে আপনাদিগের ক্ষতি স্বীকার করিত (৭)।

ঐ সময়ের কলিকাতাবাসী প্রধান প্রধান বাঙ্গালীরা ইংরেজদিগকে লইয়া প্রায়ই ভোজের সমারোহ করিতেন। তাহাতে উভয় জাতীয় লোকের একত্র সমাগম বৃদ্ধি হওয়াতে বাঙ্গালীরা আপনাদিগের সামাজিক দোষ সমস্ত সংশোধন করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীদিগের দানও ক্রমশঃ ইংরাজদিগের প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যের প্রতি প্রবর্ত্তমান হইতে লাগিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটীতে একলক্ষ টাকা দান করেন। বাবু মতিলাল শীল মেডিকেল কালেজের সূতিকা হস্পিটালে একলক্ষ টাকা প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন এবং যে ভদ্র সন্তান কোন বিধবার পাণিগ্রহণ করিবেন তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। ঐ সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিলাত গমনেও অভিমতি হয়।

ইংরাজী লেখা পড়ার ফলও ঐ সময় হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি একটী সভা করিয়া (৮) প্রচলিত ধর্ম্ম প্রণালী, সামাজিক প্রণালী এবং শাসন প্রণালীর বিষয়ে যে সকল রচনাবলী এবং বক্তৃতা প্রচারিত করেন তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে, ইউরোপীয় মত সকল ক্রমশঃ এদেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ঐ সময়ে বক্তৃতার যে প্রকার আড়ম্বর, কার্য্যের উদ্যোগ তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় নাই। কিন্তু তজ্জন্য তাৎকালিক যুবগণের প্রতি কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহারা যে সকল অভিমত শিখিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বতোভাবেই নূতন। বোধ হয়, তখনও বিশিষ্টরূপে তৎসমুদায়ের পদার্থগ্রহ হয় নাই। সুতরাং তাঁহারা যে নিতান্ত শিশুদিগের

(৭) রিফরমর।

(৮) সোসাইটী ফর দি ডিফিউজন অব ইউজফল নোলেজ।

ন্যায় পদার্থগ্রহ ব্যতিরেকেও নূতন শিক্ষিত শব্দ সমস্তের বারংবার উচ্চারণ করিবেন ইহা অবশ্যই সম্ভাব্য। কিন্তু আর একটী সভাও ঐ সময়ে সংস্থাপিত হয়। ইহা উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার ফল অধিকতর কালব্যাপী হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্ব্বতোভাবে রাজকীয় কার্য্যবিষয়ে সম্পর্ক শূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা এবং ধর্ম্ম প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল সমস্ত তেমনি দূরতর পরবর্ত্তী পুরুষগণের ভোগ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে নদী উচ্চতর পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হয়, তাহার প্রবাহও তেমনি দূরগামী হইয়া থাকে।

কিন্তু তখনকার লোকেরা তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যবিষয়ে যে প্রকার মনোযোগ করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা বর্দ্ধমানের জাল রাজার মোকদ্দমায় সবিশেষ মনোযোগী হন। বর্দ্ধমানাধিপতির ঔরস পুত্র প্রতাপচন্দ্র পিতার জীবন সত্ত্বে প্রাণত্যাগ করিলে উল্লিখিত রাজা আপন শ্যালকপুত্রকে দত্তক গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে এক ব্যক্তি আপনাকে প্রতাপচন্দ্র বলিয়া প্রকাশ করত বর্দ্ধমানের জমিদারী অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে সিংহভূমি, মানভূমি, প্রভৃতি প্রদেশের জমীদারবর্গকে আপনার সাহায্যার্থ আহ্বান করে। ঐ ব্যক্তি প্রথমে বাঁকুড়া জিলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। পরে হুগলীতে এবং সুপ্রিম কোর্টে তাহার বিষয়ে মোকদ্দমা হয়, এবং উভয় স্থলেই ঐ ব্যক্তি জাল সাব্যস্ত হইয়া যায়। কিন্তু দেশীয় লোকেরা অনেকেই তাহাতে বিশ্বাস করেন নাই। অনেকেই ঐ জাল রাজার পক্ষ হইয়া মনে মনে এমত বিবেচনা করিতেন যে, গবর্ণমেণ্ট অবিচার করিয়া প্রতাপচন্দ্রকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন। ফলতঃ ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করা এবং জাল রাজাকে বর্দ্ধমানের অধিকার না দেওয়া এই উভয় কারণেই তখনকার গবর্ণমেণ্ট জন সাধারণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন।

কিন্তু ইংরেজদিগের সহিত সম্পর্কাধীন যে, আমাদিগের শিল্পজাত সমুদায় উৎসন্ন হইয়া যাইতেছিল, প্রতি বর্ষে ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রোপ্রাইটরদিগের উদর পূরণার্থ এদেশ হইতে তিন কোটি টাকা প্রেরিত হইতেছিল, কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের নিমিত্ত দেড় কোটি টাকা খরচ হইতেছিল, অন্যূন সাড়ে চারি শত সিবিলিয়ান সাহেব যে, আমাদিগের দেশের প্রধান প্রধান সমুদায় কার্য্যই হস্তগত করিয়া বার্ষিক ৪৫ হাজার হইতে ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন লইতেছিলেন, যেন তেন করিয়া কেবল সাহেবদিগেরই চাকুরী বৃদ্ধির উপায় করা হইতেছিল, পুলিসের ও অপরাপর সকল আদালতের অবস্থা এমত যে, ঘুষ না দিলে কোন কাজই পাওয়া যাইত না, বিশেষতঃ কালেক্টরীর ভয়ঙ্কর বন্দোবস্তের জ্বালায় প্রজা সমস্ত একেবারে নিষ্পীড়িত হইয়া যাইতেছিল, এই সকল বিষয়ে কোন বাঙ্গালীরই তখন দৃষ্টিপাত করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই।

। দ্বিতীয় অধ্যায় ।

লর্ড এলেনবরা ।

১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮শে তারিখে লর্ড এলেনবরা ভারত-বর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন। ইনি বহু পূর্ব্বাবধি এতদ্দেশীয় শাসন কার্য্যের প্রতি মনোযোগী থাকিয়া, পুস্তকাদি পাঠের দ্বারা দূরবর্ত্তী ভিন্ন দেশের বিষয় যতদূর জানিতে পারা যায়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহা সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন। ইহাঁর প্রকৃতিতে স্বাধীন বুদ্ধিমত্তাও বিলক্ষণ বলবতী ছিল। ইনি অন্যের প্রতি নির্ভর করিয়া চলিতে ভাল বাসিতেন না। আপনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন। কিন্তু ইহাঁর স্বাবলম্বন, স্বৈরাচার এবং নিতান্ত সাহঙ্কার ব্যবহার বিদূষিত ছিল। আর ইনি অন্যের মুখাপেক্ষা করিতেন না বলিয়া বহুস্থলেই স্বকৃত কার্য্য সমস্তের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে না পারিয়া মধ্যে মধ্যে অতি অযোগ্য কর্ম্ম সকলই করিয়া ফেলিতেন।

যে দেশের শাসন প্রণালী সর্ব্বতোভাবে নিয়মতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে তথায় শাসনকর্ত্তার প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন, তজ্জন্য শাসন প্রণালীর কোন বিশেষ পরিবর্ত্ত ঘটিতে পারে না, কিন্তু যেখানে নিয়মতন্ত্রতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই সেখানে শাসনকর্ত্তার প্রকৃতির উপরেই শাসনপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী উল্লিখিত উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। নিয়মতন্ত্র ইংলণ্ডের সহিত সম্পর্কাধীন, ইহার শাসন-প্রণালী স্থূল ,স্থূল কয়েকটী বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই নিয়মাধীন হইয়াছে, আবার পক্ষান্তরে এতদ্দেশীয় জনগণ রাজকার্য্য বিষয়ে একান্ত উদাসীন বলিয়া এখানকার গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর সর্ব্বতোভাবেই স্বেচ্ছাচার শক্তিসম্পন্ন হইয়া আছেন। এমন অবস্থায় গবর্ণর জেনেরেলের স্বভাব যেরূপ, রাজকার্য্যের প্রণালী [illegible]

স্বভাবের অনুগামী হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ফলতঃ বেণ্টিঙ্কের সময় হইতে যে কার্য্যপ্রণালী প্রচলৎ হইতে আরম্ভ হইয়া মেট্‌কাফ্‌ এবং অক্‌লণ্ডের সময় পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিয়া আসিয়াছিল, স্বৈরস্বভাব এলেনবরার সময়ে সেই প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইল।

ঐ পরিবর্ত্তের লক্ষণ প্রথমাবধিই স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। লর্ড এলেনবরা এদেশে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন যে, কাবুলের যুদ্ধে ইংলণ্ডীয় সৈন্য পরাভূত এবং বিনষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে, চীনের যুদ্ধও চলিতেছে, যুদ্ধের ব্যয় সংকুলান করিবার নিমিত্ত পাঁচ টাকা সুদের ঋণ খোলা রহিয়াছে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর রাজকার্য্যে যত টাকা ব্যয় হইত তাহা অপেক্ষা বার্ষিক এক কোটি টাকা অধিক ব্যয় হইতেছে (১) কৌন্সিলের মেম্বরেরাও প্রশ্রয় প্রাপ্তির বহুবিধ চিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন (২) এই সকল দেখিয়া এলেনবরা বাহাদুর সত্বরেই কৌন্সিলের হাত ছাড়াইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন এবং তথা হইতে ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্য-কলাপের প্রতি কটাক্ষ করত (৩) তদ্দোষ সংশোধনার্থ কাবুল রাজ্য পরিত্যাগ করিবার এবং রাজ্যের আয় ব্যয় বিষয়ক উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন (৪)। অকলণ্ডের সময়ে গঙ্গার খাল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে কল্পনা হইয়াছিল (৫) আর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশ জরীপ করিবার যে সূত্রপাত হইয়াছিল (৬) এবং ঠগীনিবারণের অভিসন্ধিতে যে কমিস্যন বসিয়াছিল (৭) এলেনবরা সাহেব তৎসমুদায়ও রহিত করিয়া দিলেন।

---

(১) এলাহাবাদের ঘোষণা।
(২) আর্ল অব্‌ রাইপনের পত্র।
(৩) সিমুলিয়ার ঘোষণা।
(৪) ফাইনান্স্যাল কমিটির নিয়োগ।
(৫) মেজর্‌ কটলির রিপোর্ট।
(৬) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রেবিনিউ সর্ব্বের রিপোর্ট।
(৭) কর্ণেল সীমানের নিয়োগ।

ফলতঃ লর্ড এলেনবরা কেবল সৈনিককার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন। পূর্ব্বাবধি তাঁহার এই সংস্কার ছিল যে, ভারতবর্ষ রাজ্য কেবল অস্ত্রবলেই বিজিত হইয়াছে এবং উহা অস্ত্রবলের প্রভাবেই সংরক্ষিত হইবে। নিরন্তর সৈনিক কার্য্য লইয়া থাকাতে সেই সংস্কার আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিল এবং তিনি স্পষ্টরূপেই বলিতে লাগিলেন যে, আমি সৈনিকদিগেরই বন্ধু, আমার প্রকৃত স্থান কলিকাতার কৌন্সিল্ গৃহের মধ্যে নহে, উহা সংগ্রাম স্থলে সেনাপতির পার্শ্বদেশে (১)। বেণ্টিকের সময় অবধি যেন এমত একটি চেষ্টা হইতেছিল যাহাতে এতদ্দেশীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বিজাতীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতে না পারেন। এলেনবরা সেই ভ্রমটী একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিলেন। গজনী নগর বিজিত হইলে তিনি মৃত মহীপাল মহম্মদের সমাধিমন্দির হইতে সোমনাথ দেবের দ্বার খুলিয়া আনিয়া সেই দ্বার সোমনাথ দেবের মন্দিরে প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছিলেন এবং তৎকালে অবশ্যই ইহাও মনে মনে করিয়াছিলেন যে, এই কার্য্যে হিন্দুরা অত্যন্ত প্রীত হইবে, কিন্তু বাস্তবিক উহার দ্বারা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহার প্রীতি জন্মে নাই। যাহা আন্তরিক নয় তাহার ভান করিয়া অপর লোকের চক্ষুতে ধূলি দিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র—যে ঐরূপ চেষ্টা করে সেই ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই উহাতে ঠকে না।

যাহা হউক, এলেনবরা সাহেব যুদ্ধকার্য্য লইয়াই রহিলেন। বাঙ্গালার শাসন কর্তৃত্ব, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর বর্ড সাহেবের প্রতি অর্পিত থাকিল। এমন কি এলেনবরা বাহাদুর একবার রাজধানীতে আসিয়াও স্বয়ং বাঙ্গালার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন না। বর্ড সাহেব বিলক্ষণ বিচক্ষণতা সহকারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি প্রায় সমুদয়ই নির্ব্বিঘ্নে প্রচলিত হইয়া যাইতে লাগিল। বর্ড সাহেবের অধিকারের সময় ক্রীত দাস রাখিবার প্রথা উঠিয়া যায়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, অনেকেরই ঘরে কেনা চাকর বা গোলাম রাখিবার রীতি

(১) বারাকপুরের থানায় এলেনবরার বক্তৃতা।

বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল। হিন্দু শাস্ত্র এবং মুসলমান শাস্ত্র কোন শাস্ত্রই ঐ ব্যবহারের নিষেধ করিত না। কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত সংশ্রবাধীনে নর বাণিজ্য রহিত, হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল। অতএব এই অভিপ্রায়ে আইন প্রস্তুত করা হইল যে, ইংরেজাধিকারের মধ্যে সকলেই স্বেচ্ছাতঃ আদালতে নালিষ করিতে পারিবে এবং সকলেই স্বোপার্জিত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। এরূপ আইন হওয়াতে কাজেকাজেই ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা উঠিয়া গেল।

বর্ড সাহেবের সময়ে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের বিধিও প্রচলিত হইল এবং দারোগাদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হইল (১) তদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে বিচারপতিগণ অনেক স্থলেই স্বয়ং মোকদ্দমার রায় লিখিতেন না; তাঁহাদিগের সেরেস্তাদারেরাই ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এক্ষণে এমত আইন হইল যে, বিচারপতিদিগকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় স্বহস্তে মোকদ্দমার রায় লিখিতে হইবে। অধিকন্তু ইউরোপীয়েরা একাল পর্য্যন্ত মুন্সেফি আদালতের অধীন ছিলেন না; এক্ষণে তাঁহারা ঐ সকল আদালতের অধীন হইলেন (২)। বর্ড সাহেব আর একটি প্রধান কার্য্য করিয়াছিলেন। একটি স্ফূর্ত্তি খেলার কাণ্ড বহু কালাবধি রাজধানীতে চলিয়া আসিতেছিল। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ লাভ হইত এবং লাভের অধিকাংশ রাজধানীর পথ ঘাট নির্ম্মাণের এবং উহার শোভা সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত ব্যয়িত হইত। গবর্ণমেণ্টের স্ফূর্ত্তি খেলা থাকায় অপরাপর হৌসওয়ালা বণিকেরা এবং সামান্য গৃহস্থেরা অনেকে ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যাপার যে সমূহ অমঙ্গলাবহ তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যকতা কি। যে দেশের লোকেরা সর্ব্বদা আপনাপন অদৃষ্ট পরীক্ষায় অনুরক্ত হয়, তাঁহারা শ্রমার্জ্জিত অর্থের তাদৃশ গৌরব করে না; প্রত্যুত শ্রমার্জ্জিত না হইলে অর্থের কোন গৌরব নাই ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না; সুতরাং স্ফূর্ত্তির ব্যাপার প্রচলিত থাকিলে লোক সকলকে নিতান্ত

(১) হ্যালিডে সাহেবের ৭৫৪ নং পত্র।

(২) ১৮৪৩ সালের ৬ আইন।

অপরিণামদর্শী, অসাবধান, এবং ভাবিচিন্তা পরিশূন্য করিয়া তুলে। জুয়া খেলার যে যে দোষ, স্ফূর্ত্তি খেলারও সেই সমুদায় দোষ আছে। ইংলণ্ড হইতে ঐ ব্যাপার প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছিল। উহা এখানেও সুপ্রীম কোর্টের আইনের বিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছিল (১) তথাপি গবর্ণমেণ্ট ধনলোলুপ হইয়া উহা প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে বর্ড সাহেব উহা উঠাইবার নিমিত্ত ডিরেক্টরদিগের অনুমতি চাহিলেন। অনন্তর গবর্ণমেণ্টের স্ফূর্ত্তি খেলা একেবারেই রহিত হইয়া গেল। এই সময়ে আর দুটি কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা এরূপ প্রশংসনীয় নহে। পূর্ব্বে কুলির বাণিজ্য রহিত হইয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে উহা আবার প্রবর্ত্তিত হইয়া ১৮৪২ সালের মধ্যেই ১৭হাজার ৯শত কুলি মরিস্যস্ দ্বীপে প্রেরিত হইল; জেল সকলে কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভরণ পোষণের ব্যয় অতিরিক্ত হয় বলিয়া আঘাত দণ্ড বিধানের একটি আইন ঐ সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছিল। আঘাত দণ্ডের বিধি যে কোন মতেই ভাল নহে ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ, উহা অন্যায্য হইলে প্রতিবিধানের আর কোন উপায়ই থাকে না; দ্বিতীয়তঃ, উহা যাহার প্রতি একবার প্রযুক্ত হইয়াছে সে দাগী হইয়া যায়, আর কখন সমাজের মধ্যে সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারে না; তৃতীয়তঃ যেখানে আঘাত দণ্ডের বিধি প্রচলিত থাকে, সেই সেই স্থলেই বিচারপতিদিগের অনবধানতা জন্মে। চতুর্থতঃ, যেখানকার মাজিষ্ট্রেটেরা ভিন্নজাতীয় লোক এবং দেশীয় লোকের ভাবানভিজ্ঞ ও ও তাঁহাদিগের মানাপমান জ্ঞানশূন্য তথায় আঘাতদণ্ডের প্রণালী প্রজাব্যূহের সাতিশয় ভয়াবহ হইয়া থাকে। আঘাতদণ্ডের একমাত্র গুণ, উহা প্রচলিত থাকিলে গবর্ণমেণ্টের খরচ কম হয়। বিশেষতঃ ঐ সময়ে উল্লিখিত বিধি প্রচলিত করায় খরচ কম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। পূর্ব্বে কয়েদীদিগকে একবার মাত্র আহার দিবার নিয়ম ছিল, ঐ সময়ে তাহাদিগকে দুই সন্ধ্যা আহার দিবার নিয়ম করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন

(১) জোন্সের মোকদ্দমা।

গবর্ণমেণ্ট উহাদিগের আহারের যোট রান্ধিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। জাতিপাত ভয়ে কয়েদীরা একত্র ভোজন করায় একান্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।

যাহা হউক, বেণ্টিক সাহেব সিপাহীদিগকেও আঘাত দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। এলেনবরার সময়ে সামান্য অপরাধীদিগের প্রতিও দণ্ডবিধানের প্রস্তাব হইয়াছিল। বেণ্টিক সাহেব যুদ্ধকার্য্যে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন। এলেনবরার সময়ে সিন্ধুদেশ অধিকৃত হয়, এবং গোয়ালিয়রের রাজা সংগ্রামে পরাভূত হইয়া হীনসন্ধি করেন। বেণ্টিক সাহেব এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপনের উপক্রম করিয়া যান, এবং মেটকাফ সাহেব উহা বিধিবদ্ধ করেন, এবং অকলণ্ড বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগকেও সংবাদ পত্রে লিখিবার অনুমতি দেন। এলেনবরা স্বয়ং এ দেশীয় কোন সংবাদপত্রই পাঠ করিতেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগকে সংবাদপত্রের সংস্রব হইতে স্পষ্টাক্ষরে নিবারণ করেন (১)—বেণ্টিক সাহেব সৈনিকবর্গের ভাতা দিবার নিয়ম রহিত করিবার চেষ্টা পান। এলেনবরার সময়ে সিন্ধুদেশে প্রেরিত সিপাহীরা (২) বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলে তিনি পুনর্ব্বার উহাদিগকে ভাতা দিতে স্বীকার করেন। বেণ্টিক সাহেব এখানকার বিদ্যালয় সমস্তের একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এলেনবরা যত দিন এদেশে ছিলেন তন্মধ্যে একদিনও কোন বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আইসেন নাই। বেণ্টিক সাহেব, কি ইংরাজ কি এদেশীয় যে ব্যক্তি প্রার্থনা করিত তাহারই সহিত আলাপ করিতেন। এলেনবরা সাহেব কাহারও সহিত কর্ম্মোপলক্ষে দেখা করিতে সম্মত হইতেন না। কিন্তু এই সকল করিয়াও, এলেনবরা বাহাদুর কোর্ট-অব্ ডিরেক্টরদিগের বিরাগভাজন হইতেন না এবং পূর্ণ পাঁচ বৎসর এখানকার শাসনকর্তৃত্ব নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, যদি তাঁহার কিছুমাত্র সাবধানতা থাকিত, যদি তিনি সিবিল সার্বিসের নিতান্ত

(১) ৩০শে আগষ্ট ১৮৪৩ সাল।

(২) ৬৪ সংখ্যক পদাতি দল, বাঙ্গাল সৈন্য।

বিরোধী (১) মিলিটারীদলের একান্ত পক্ষপাতী এবং ডিরেক্টর সভার সম্যক্ অবমাননাকারী না হইতেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা তাঁহার কৃত অপমান বার বার সহ্য করিয়া পরিশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়াই তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। এলেন্‌বরার সময়ে বাঙ্গালায় আমদানী ৫ কোটি ৭১ লক্ষ এবং রপ্তানী ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার হুইয়াছিল। ৪২।৪৩ সালে নীল ভালরূপ জন্মে নাই। তাহাতে কলিকাতার য়ুনিয়ন্ ব্যাঙ্কের কার্য্যে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরেরা নীলকর সাহেবদিগকে অনেক টাকা ধার দিতেন। নীল অজন্মা হওয়াতেও ঐ বৎসর টাকা আদায়ের পক্ষে বিশিষ্ট শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় কার্পাস বস্ত্রের বাণিজ্যও দিন দিন ন্যূন হইয়া আসিয়া যাহা ১৮১৬।১৭ সালে ১ কোটি ৬৫ লক্ষের অধিক ছিল, তাহা ১৮৪২।৪৩ সালে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা মাত্র দাঁড়াইয়াছিল। এতদ্দেশজাত তুলার রপ্তানী ৩৫ সাল হইতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত গড়ে, প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার মণ করিয়া হইয়াছিল, কিন্তু ৩৯ সাল হইতে ৪৩ সাল পর্য্যন্ত উহার বার্ষিক গড় ১ লক্ষ ৬১ হাজার মণের বড় অধিক হয় নাই।

কিন্তু চিনির ব্যবসায় বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৪২।৪৩ সালে উহা ১ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩ শত ৭৩ টাকা হইয়া উঠিয়াছে। সমুদায় বাণিজ্যের শুল্ক দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আয় ৪২।৪৩ সালে ২৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা হইয়া ছিল (২)। কৃষির ঔৎকর্ষ বিষয়ে ঐ সময়ে বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। আগরা এবং ভগলপুরে দুইটী এগ্রিকলচুরেল সোসাইটী সংস্থাপিত হইয়াছিল। আর এদেশীয় গোধূমের প্রতি ইংলণ্ডে যে অতিরিক্ত শুল্ক গ্রহণ করা হইত তাহা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভার নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট সে সময়ে ভারতবর্ষীয় দ্রব্যের আমদানি

(১) এলেনবরা সাহেব সিবিলিয়ান দিগকে সাহজাদা বলিয়া গালি দিতেন।

(২) উইলকিন্‌সন সাহেবের কমর্স্যল আনুয়াল।

অধিক হয় ইহা কোন মতেই ভাল বাসিতেন না, ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাতের প্রতি অতিরিক্ত শুল্ক লইবার রীতি প্রচলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কানেডা প্রদেশ হইতে যে গোধূম আসিত তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ষ জাত গোধূমের উপর এক শিলিং অধিক শুল্ক নিরূপিত ছিল। এখানকার চিনির প্রতি ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়জাত চিনির অপেক্ষা অধিক শুল্ক লওয়া হইত।

'সূর্য্যাস্তের আইন' প্রচলিত হইয়া অবধি অনেকানেক প্রাচীন জমীদারের সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া উহা সধন ব্যক্তিদিগের হস্তে আসিতে আরম্ভ হওয়ায় ক্রমশঃ জমীদারীর মূল্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া বৰ্দ্ধিষ্ণু হইতেছিল। কলিকাতার আধুনিক বড় মানুষেরা ঐ সময় জমীদারদিগকে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইবার নিয়মে টাকা ধার দিয়া আপনারা ভূমি সম্পত্তির অধিকারী হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন (১)। ফলতঃ লর্ড করণওয়ালিস্ যে অভিসন্ধিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করিয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার সেই অত্যুদার অভিসন্ধির অকিঞ্চিৎকরত্ব স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বাকীর দায়ে জমীদারী বিক্রয়ের কঠিন আইন চলিলেই এখানে যে স্থায়ী ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় সমুৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতে আরম্ভ হইল। প্রাচীন জমীদারদিগের ঘর সকল চূর্ণ হইয়া যাইতে থাকিল। ইহাতে আরও একটী দোষ জন্মিল। বুনিয়াদি, জমীদারেরা প্রায়ই প্রজাপীড়ক হয়েন না, আধুনিক জমীদারদিগের প্রজার প্রতি মমতা অল্প হয়, সুতরাং তাঁহারা যৎপরোনাস্তি প্রজাপীড়ন করিয়া থাকেন। এই সময়ে জমীদারীর পত্তনে বিলিও সমূহ পরিমাণে হইতে লাগিল। অলসস্বভাব জমীদারেরা পত্তনে দিয়া আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া লাভের অংশ ভোগ করিবেন এমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। পত্তনে বিলি করিলেই যে জমীদার আপনার তাবৎ দায় হইতে মুক্ত হইলেন ইহা স্বীকৃত হইল না (২)। ফলতঃ ঐ সময়ে জমীদার জমীদারে,

(১) কানাইলাল ঠাকুর ও হলধর ঘোষের মোকদ্দমা।

(২) সদর দেওয়ানীতে তিরহুট প্রদেশীয় নীলকর দিগের মোকদ্দমা।

নীলকর নীলকরে এবং জমীদার নীলকরে বিবাদ পরম্পরায় নিরন্তরই লাঠীবাজী, ডাকাইতি, লুঠ ও গুমখুনির কাণ্ড চলিয়াছিল (১)। কিন্তু ঐ সময় হইতেই সিবিলিয়ান সাহেবেরাও নীল কুঠীর সহিত ক্রমশঃ নিঃসম্পর্ক হইতে লাগিলেন।

মফস্বলের অবস্থা এইরূপ। কিন্তু রাজধানীতে ইংরাজী বিদ্যার চর্চ্চাবাহুল্য হওয়ায় ক্রমশঃ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ পূর্ব্বাপেক্ষায় প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন। বিশেষতঃ জর্জ্জ টমসন্ নামা যে মহাত্মা ঐ সময়ে এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাগ্মিতাপ্রভাবে এখানকার যুবদল একেবারে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে উহাঁরা ব্যর্থবাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া দেশের প্রকৃত শুভানুধ্যান করিবার নিমিত্ত যত্নবান হইলেন। টমসন্ সাহেব এই কয়েকটী শিক্ষা দেন—প্রথমতঃ, এখানকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই একবাক্য হইয়া দেশের মঙ্গলসাধন চেষ্টায় রত হওয়া কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়তঃ স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান বিবরণ সমস্ত বিশিষ্টরূপে অবগত হওয়া ইহাঁদিগের উচিত; তৃতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা প্রচারিত হইলেই তাহাতে আপনাদিগের অভিমত খ্যাপন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, চতুর্থতঃ ইংলণ্ডীয়দিগের ন্যায়পরতার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করা বিধেয়। টমসন্ সাহেবের পরামর্শানুসারে বেঙ্গল ব্রিটিশইণ্ডিয়া সোসাইটী নামক সভা সংস্থাপিত হইল। ঐ সভাই এ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় জনগণের মুখ স্বরূপ হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন।

যখন প্রথম এই সভার সূত্রপাত হয়, তখন কি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী কি শ্রীবৃদ্ধিকারী, কি সংবাদপত্রের সম্পাদক, কোন প্রকার ইংরেজই

(১) ক্লার্ক সাহেবের মোকদ্দমা। জয় চাঁদ পাল চৌধুরীর মোকদ্দমা। রাম রতন রায়ের মোকদ্দমা।

উহাঁর অনুমোদন করেন নাই। (১) সকলেই উহাঁর প্রতি বিদ্রূপ এবং ব্যঙ্গোক্তি করিয়া যাহাতে সভ্যেরা উৎসাহবিহীন হয়, এমত যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই উৎসাহ নিবারিত হইল না। প্রত্যুত ভূম্যধিকারী সভাও বহুকালের পর এই সময়ে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রোপ্রাইটর সভার নিকট উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্য পাইবার প্রত্যাশায় এতদ্দেশীয়দিগের আবেদন পত্র প্রেরিত হইল, পুলিসের এবং অপরাপর বিষয়ের দুই একটী আইন সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট পরামর্শ প্রদান করা হইল, এবং ঐ সময় হইতে নানাপ্রকারে এখানকার লোকেরা আপনাদিগের সজীবতার চিহ্ন প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

(১) ইংলিসম্যান, ষ্টার প্রভৃতি সংবাদপত্রে চক্রবর্ত্তী দলের প্রতি গদ্য পদ্যময় অনেক ব্যঙ্গোক্তি প্রচারিত হয়। সাধুশীল তেজস্বিস্বভাব তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামানুসারেই ঐ দলের নামকরণ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:**:—

লর্ড হার্ডিঞ্জ।

কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা লর্ড এলেনবরাকে কার্য্যচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে হার্ডিঞ্জ সাহেবকে নিযুক্ত করেন। নিয়োগকালীন ডিরেক্টরদিগের সভাপতি তাঁহাকে এই কয়েকটী কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেন।—কৌন্সিলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলা গবর্ণর জেনেরলের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক যে, সিবিলিয়ান সাহেবেরা ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তই বিশেষরূপ শিক্ষা পাইয়া থাকেন। পার্য্যমাণে যুদ্ধ ঘটনা উপস্থিত হইতে না দেওয়া উচিত। রাজ্যের ব্যয় লাঘব এবং আয় বৃদ্ধির উপায় করা বিধেয়। সদয় ব্যবহার দ্বারা সিপাহী সৈনিকদিগকে অনুরক্ত রাখিবার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। কোন ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করা উচিত নয়। যাহাতে ভারতবর্ষীয় প্রজাসাধারণের বিদ্যোন্নতি হয়, তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিশেষে ডিরেক্টরদিগের সভাপতি এই একটী অতি সারবান কথা বলেন যে, "ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য কেবল মাত্র অস্ত্রবলে রক্ষিত হইবার নহে। আমাদিগের ধর্ম্মশীলতা এবং বাঙ্নিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাসবশতঃ তদ্দেশীয় প্রজাব্যূহের যে শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ জন্মিয়াছে, আমরা তাহারই প্রভাবে ঐ সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারিয়াছি এবং কেবলমাত্র তাহারই গুণে ঐ রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।"

হার্ডিঞ্জ সাহেব ১৮৪৪ সালের ২৩শে জুলাই তারিখে কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য গ্রহণ করিলেন। ইনি ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল এলেনবরার ন্যায় প্রখর-স্বভাব ছিলেন না। যদিও ইহাঁর জীবিতকালের অধিকাংশ সৈনিক কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল, তথাপি ইনি যুদ্ধকার্য্যে তাদৃশ অনুরক্ত না হইয়া প্রত্যুত মিতাত্ম শান্তি-প্রিয়

ছিলেন। ইনি নিজ স্বভাবের অনুগ্রতাবশতঃ অনায়াসেই ডিরেক্টরদিগের উপদেশের অনুসরণ করত আপন কৌন্সিল এবং সেক্রেটারীবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিতে পারিলেন। এতদ্দেশীয় প্রজাব্যূহের প্রতি অনুগ্রহ এবং অনুরাগ প্রদর্শন করাও ইঁহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় নাই। ১৮৪৪ সালের অক্টোবর মাসে যে ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইল, তদ্দ্বারাই এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবর্গ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, এলেনবরা সাহেব হইতে নিতান্ত ভিন্নপ্রকৃতিক কোন ব্যক্তি শাসনকার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ ঘোষণা পত্রের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এই অনুমতি করেন যে, লেখাপড়া জ্ঞানসম্পন্ন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতে কদাপি অপর ব্যক্তিকে কোন প্রকার রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে না। হার্ডিঞ্জ সাহেব ঐ সময়েই দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে মাসিক ১৮৬৫ টাকা ব্যয়ে ১০১টী বাঙ্গালা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার অনুজ্ঞা করেন। ফলতঃ এই সময় হইতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ায় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অভিমতি হয়। ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮২৪ সাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত এবং আরবী এই দুই প্রাচীন ভাষা শিখাইবার নিমিত্ত চেষ্টা এবং অর্থব্যয় অবাধে করা হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৩৪ সাল হইতে কেবল ইংরাজী শিখাইবার নিমিত্তই যত্ন করা হয়, অনন্তর ১৮৪৪ সালে দেশীয় প্রচলিত ভাষার বিদ্যালয় সমস্তের প্রথম সূত্রপাত করা হইল। কিন্তু তজ্জন্য যে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতি যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইয়াছিল, এমত নহে। কৃষ্ণনগর কলেজ এবং হাবড়া ও বাঁকুড়ার জিলা স্কুল ঐ সময়ে সংস্থাপিত হয়; আর কলিকাতায় একটী বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত পরামর্শ হয়।

এই সকল কার্য্যের দ্বারা হার্ডিঞ্জ সাহেব এতদ্দেশীয় জনগণের যেরূপ অনুরাগভাজন হইলেন, তাহা ঐ সময়ে যে "লেক্স লোসি" নামক ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হয়, তদ্দ্বারাও সর্ব্বতোভাবে অপনীত হয় নাই। "লেক্স লোসির" প্রধানতম অভিপ্রায় এই যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত নিবন্ধন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে বঞ্চিত না হয়। হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মের শাসনানুসারে যে ব্যক্তি আপন পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ

করে, সে পতিত এবং মৃতবৎ গণ্য হইয়া পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছিলেন (১) যে তাঁহারা দায়সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রা-নুযায়ী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবস্থা সমস্ত প্রবল রাখিবেন। প্রথমতঃ তাহাই করা হইয়াছিল। কোন হিন্দু বা মুসলমান, খৃষ্টান হইলে সে আপন পৈতৃক বিষয় কিছুই প্রাপ্ত হইত না। পরে লর্ড বেণ্টিকের সময়ে বাঙ্গালায় 'লেক্‌সলোসির' ব্যবস্থা প্রণীত হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ ব্যবস্থা সমুদায় ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় প্রচারিত হওয়াতে হিন্দু সমাজে অতি তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। ফলতঃ এই সময়ে কয়েকটী এতদ্দেশীয় যুবক মিসনরী স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করায় কলিকাতাবাসী ধনাঢ্য হিন্দুগণ সকলে এক মত হইয়া মিসনরী বিদ্যালয় সমস্তের বিরুদ্ধে একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ কোন ফলই সমুৎপন্ন হয় নাই। বাবু মতিলাল শীল লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'শীলস্ কলেজ' নামধেয় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অপর ধনিগণের প্রদত্ত টাকা হইতে আর একটি সামান্য বিদ্যালয় মাত্র (২) সংস্থাপিত হয়। যে সময় কলিকাতার ধনশালী বাবুরা এইরূপে স্বধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা করেন সেই কালে কয়েকজন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবা পুরুষ (৩) খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধমত ইংরাজীতে লিখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রচা-রিত করিতে লাগিলেন। মিসনরী সাহেবেরাও তজ্জন্য উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল বিরুদ্ধমতের প্রতিবাদ (৪) করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর, তত্ত্ববোধিনী সভাও এই সময়ে বিশিষ্টরূপে আপন বলপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইহার সভ্য সংখ্যা আট শতের অধিক হইয়াছিল।

(১) ১৭৭২ সালে কৌন্সিলের প্রেসিডেন্টের অনুজ্ঞা।
(২) হিন্দু চ্যারিটেবল ইনিষ্টিটিউসন।
(৩) বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, কালীকুমার দাস প্রভৃতি।
(৪) আণ্টি ইন্‌ফিডেল,ট্রাক্টস্‌।

এই প্রদেশে বেদ বিদ্যা প্রবিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে চারিটি ব্রাহ্মণ সন্তান ঐ সভার ব্যয়ে বারাণসীধামে বেদাধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী উৎসাহশীল যুবদল মিসনরীদিগের দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময় হইতেই এদেশে খৃষ্টধর্ম্মের বৃদ্ধির পরিণাম হইল। ইহার পরেও কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন বটে; কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে ছেলেরা ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান হইবে বলিয়া লোকের যে প্রকার ভয় ছিল, ঐ সময় অবধি সেই ভয়ের হ্রাস হইতে লাগিল।

এরূপ হইবার বিলক্ষণ কারণই রহিয়াছে। ইংরাজদিগের সংস্রবাধীন এতদ্দেশীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থায় অনেক দোষ আছে বলিয়া বোধ হইতেছিল। উহার সকলগুলিই যে দোষ নয়, পরন্তু এদেশীয়দিগের অবস্থার বিশেষ উপযোগী তাহা সে সময়ে কোন পক্ষই যুক্তিমুখে দেখিতে পান নাই। অপর কতকগুলি দোষ যাহা হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল—তাহা ক্রমশঃ সংশোধিত হইয়া যাইতেছে। অপর কতকগুলি—স্বজাতিবিদ্বেষ, দল বন্ধনে অক্ষমতা প্রভৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে সংশোধনীয় দোষ এখনও যথেষ্ট রহিয়াছে। সে যাহা হউক ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ জন্মে। সুতরাং যতদিন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে উল্লিখিত দোষ সমস্তের পরিহার হইতে পারে না, তাবৎকাল যে ধর্ম্মের শাসনানুসারে ঐ সকল দোষ সংরক্ষিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহা বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন প্রকারে একবার দৃষ্ট হয় যে, জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়াও সামাজিক দোষের সংশোধন হইতে পারে, তবে জাতীয় ধর্ম্ম স্বভাবতঃই মনুষ্যের শ্রদ্ধা এবং গৌরবের আস্পদ হইয়া থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয়—অথচ উহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে ঐ ধর্ম্মপ্রণালী বৈদেশিক শিক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থাদির উপ-

যোগ্যিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদিগের যে মনোরম হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?

তাৎকালিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বদেশীয় সামাজিক দোষ সংশোধন করাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কার্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা সেই সময়ের ভারতবর্ষীয় সভার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। ভারতবর্ষীয় সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য গুবর্ণমেণ্টের রাজনীতি এবং ব্যবস্থাসম্পৃক্ত কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তত্তদ্বিষয়ে দেশীয় জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশ করা, কিন্তু সভা ঐ সময়ে আপনাদিগের একমাত্র প্রকৃতকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা এক জন সুপ্রীমকোর্টের ইংরেজ উকীলকে আপনাদিগের সভাপতি করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কখন রাজধানী পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছিলেন, কখন পুলিসের দোষানুসন্ধান করিতেছিলেন, আর কখন বা বিধবাবিবাহের উপায় বিধান, কখন বহুবিবাহ নিবারণ, কখন স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় এবং তত্ত্ববোধিনী সভার আনুপূর্ব্বিক ক্রমে কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে, যত দিন তত্ত্ববোধিনী সভা বল প্রকাশ করিতে না পারিয়াছিলেন, তাবৎকাল ভারতবর্ষীয় সভাও আপন প্রকৃতকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু হার্ডিঞ্জ সাহেবের অধিকারকালের মধ্যেই এই উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তত্ত্ববোধিনী সভা নব্যদলের ধর্ম্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন, এবং একজন সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী (১) ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্য্য বিষয়েই সভার স্থির দৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, এ দেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, আর ইহাঁরা যাহা করিতে পারেন তাহাও অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ এই

দুইটাই অপরের সহায়তা অথবা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবি পরিবর্ত্তসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় মিসনরিদের সহিত অনুক্ষণ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও আচার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় তাহার ফলেই সনাতন হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে। হিন্দুয়ানী যে কোন প্রকার প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতির বিরোধী নহে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। আবার ভারতবর্ষীয় সভার অনুষ্ঠিত পথেই দেশময় রাজনৈতিক সভা সকল স্থাপিত হইয়া এদেশীয় লোকদিগকে রাজ কার্য্য সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অভিজ্ঞ করিতেছে। কিন্তু এই দুই প্রধান কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্র সহায়তার অপেক্ষা করা হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিষয়ে যাহা করা উচিত, তৎকালে তাহাই করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্ত্ত সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবেই ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

লর্ড করণওয়ালিসের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে দেশীয় যাবৎ রাজকর্ম্মচারীর বেতন সমষ্টি কয়েক জন সিবিলিয়ান (১) সাহেবের বেতন সমষ্টির তৃতীয়াংশ অপেক্ষাও ন্যূন করা হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ প্রণালী নিতান্ত অবিশুদ্ধ বলিয়া নিশ্চিত হওয়াতে দারোগা, জমাদার, সেরেস্তাদার এবং খাজাঞ্চিবর্গের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রস্তাব হইল (২) বিশেষতঃ তাৎকালিক ৫২৭ জন পুলিস দারোগার বেতন ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ২শত ২০ টাকা হইতে একেবারে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ২ শত টাকা করা হইল। কিছুকাল পরেই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগকেও স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইল। ফলতঃ পল্লিগ্রামে নীলকর ও জমীদারেরা পরস্পর যে সকল বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন এবং দুর্ব্বল প্রজাদিগের প্রতি যে সকল ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতেন এই সময় হইতেই তাহার শাসন

() ৪ শত ৮০ জন।

(২) আকৌণ্টাণ্ট জেনেরেলের ৩৯৫ সংখ্যক পত্র।

হইতে আরম্ভ হয় (১)। কলিকাতার পুলিসেরও ঐ সময়ে উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত হইয়া পূর্ব্বে জাহাজি গোরাদিগের যে প্রকার দৌরাত্ম্য ছিল এবং কদাচিৎ দিবাভাগেও যে প্রকার দুই একটী ডাকাইতি হইত (২) তাহার নিবারণ হয় এবং তাহার শঙ্কা অনেকাংশে নিবারিত হয়। রাজধানী পরিষ্কৃত রাখিবার এবং উহার শোভা সম্বর্দ্ধন করিবার ভারও ঐ সময়ে নাগরিকদিগের প্রতি সমর্পণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়া দেন যে, কলিকাতার মধ্যে যে ১৭ হাজার ২ শত গৃহস্বামী বাস করেন তাঁহারা স্বয়ং মনোনীত করিয়া কএক জন কমিস্যনর নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ প্রজাপক্ষ কমিস্যনরেরা গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত অপর কএক জন কমিস্যনরের সহিত একমত হইয়া নাগরিক যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। মফস্বলেও এই প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্ট এমত নিয়ম করেন যে, ফেরিফণ্ডের টাকা যাহা রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ এবং নগরাদির শোভাবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইবার বিধি(৩) আছে, তাহা আর মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে না থাকিয়া স্থানীয় সভা সমস্তের দ্বারা যথোচিত কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

বস্তুতঃ ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট অনেক লক্ষণের দ্বারাই ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রাজকার্য্যের ভার পূর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক পরিমাণে এদেশীয় লোকের হস্তে প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে। ঐরূপ ইচ্ছা না হইবেই বা কেন? গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই দেখিতেছিলেন যে তাঁহারা যে দুইশত অশীতি জন দেশীয় বিচারপতিকে বিচারকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন তাঁহারা অতি উৎকৃষ্টরূপে আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া মাসিক ৫০ হাজার টাকার ন্যূন ব্যয়ে ৪ কোটী টাকার

---

(১) এই সময়ে কাশিম বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ কুমার কলিকাতায় আসিয়া আত্মহত্যা করেন।

(২) বড় বাজারে এবং পরমিট ঘাটের উপরে ডাকাইতি এবং দাঙ্গা হইয়াছিল।

(৩) ১৮১৯ সালের ৬ আইন।

অধিকতর মূল্যের সম্পত্তির বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন (১) অতএব এদেশীয় ব্যক্তিরা যে, বিশিষ্টরূপেই কার্য্যক্ষম তাহার আর কোন সন্দেহ ছিল না। গবর্ণমেণ্ট বিচার-প্রণালীর অধিকতর ঔৎকর্ষ সাধনার্থ ভাল ভাল উকীল নিযুক্ত করা বিশিষ্টরূপে প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া ঐ সময়ে ওকালতী পরীক্ষার বিধি প্রণয়ন করিলেন (২) আর জজের পণ্ডিত অথবা কাজী নিযুক্ত করা নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হওয়াতে 'ল কমিটির' পরীক্ষা উঠাইয়া দিলেন (৩)। গবর্ণমেণ্ট ঐ সময়ে চর সম্বন্ধীয় যে আইন প্রচারিত করিলেন তাহাও নিতান্ত মন্দ হয় নাই (৪)। উহা দ্বারা মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক ন্যূন হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন, লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বন্ধ হওয়াতেও মোকদ্দমা কম হয় এবং প্রজাবর্গ বিশিষ্ট সন্তোষ লাভ করে। এই ব্যাপারে ৮০ লক্ষ টাকা মোট ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্ট এত দিনের পর বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব স্থির করেন।

এই সময়ের বিবরণ সমস্ত পাঠ করিতে গেলে ইংরাজী গবর্ণমেণ্ট যে দিন দিন প্রজাবৎসল হইতেছেন, এবং প্রজাগণও যে গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিশিষ্ট অনুরক্ত হইয়া আসিতেছেন ইহার ভূরি ভূরি লক্ষণ দৃষ্ট হইতে থাকে। ফলতঃ এতদ্দেশীয় লোকেরা বহুকালাবধি বিজাতীয় যথেচ্ছাচারী রাজার শাসনাধীন থাকিয়া এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিয়মপরায়ণ ইংরেজ রাজতায় যে অধিকতর স্বাধীন এবং সুখী হইবেন তাহার সন্দেহ কি? লোকেরা গল্প শুনিয়াছিল যে, মুসলমানদিগের মধ্যে কোন কোন অতি উদার প্রকৃতির বাদসাহ সাধারণ আদালতের বিচার মান্য করিয়া চলিতেন; ইহাই, তাঁহাদিগের পরম প্রশংসার বিষয় ছিল! কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পদে পদে আদালতের বিচার মান্য করিয়া চলিতেছিলেন। কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কতই নালিস চলিত, গবর্ণ-

---

(১) জুডিসিয়াল রিপোর্ট ১৮৪৫ সাল।

(২) ১৮৪৬ সালের ১ আইন।

(৩) ১৮৪৫ সালের ৫ আইন।

(৪) ১৮৪৭ সালের ৯ আইন।

মেণ্টও কত স্থলে সামান্য ফরিয়াদীর ন্যায় আপন প্রজার নামে সুপ্রীম কোর্টে নালিস করিয়া মোকদ্দমায় হারিয়া যাইতেন (১)। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের প্রতিও সুপ্রীম কোর্টে নালিস চলিত এবং তজ্জন্য উহারা কিঞ্চিৎ দমনেও থাকিত (২)। যাহা হউক, মুসলমানদিগের অপেক্ষা ইংরাজদিগের সময়ে যে, এতদ্দেশীয় প্রজাব্যূহের অনেক পরিমাণে স্বাধীনতার সুখবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঐ একটী সুখও যদি না থাকিত, তবে অপরাপর অনেক বিষয়ে প্রজাব্যূহের যে দুঃখের আতিশয্য হইয়াছিল, তজ্জন্য বিলক্ষণ বিরাগ জন্মিবারই সম্যক্ সম্ভাবনা ছিল। মুসলমান নবাব মুর্শেদকুলির সময়ে সুবে বাঙ্গালা রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছয় সহস্র মাত্র সেনার ভৃতি প্রদান করিতে হইত, হার্ডিঞ্জের সময়ে সৈন্য সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ সহস্রেরও অতিরিক্ত হইয়াছিল। মুর্শেদকুলির সময়ে নয় আনা করিয়া মোটা চাউলের মণ বিক্রীত হইত— হার্ডিঞ্জের সময়ে উহার দর সাত সিকারও অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। মুর্শেদকুলির সময়ে প্রতি বৎসর এক কোটি টাকা দিল্লীর বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইত, হার্ডিঞ্জের সময়ে বিলাতীয় প্রোপ্রাইটর সভার নিমিত্ত ৬৩ লক্ষ, ডাইরেক্টর সভার নিমিত্ত ১৫ লক্ষ, এবং বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের নিমিত্ত ২ লক্ষ ৬০ হাজার, সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা করস্বরূপে যাইত, আর ইংরেজ কর্ম্মচারিবর্গের বেতনের আকারে উহা অপেক্ষাও অনেক টাকা এদেশ হইতে বাহির হইয়া যাইত।

বাণিজ্য সম্বন্ধেও অনেক বিষয়ে এদেশীয়দিগের অমঙ্গল চিহ্ন সমস্ত লক্ষিত হইতেছিল। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে এদেশ হইতে দুই কোটি টাকার অধিক মূল্যের বস্ত্র ইউরোপে প্রেরিত হইত; উহা ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া ১৮৭৬ সালে ৯৬ টাকা মাত্র দাঁড়াইয়াছিল, এবং ৪৭ সালে কিছুই ছিল না। এদেশ হইতে কাপড়ের রপ্তানি হইবে কি, ৪৭ সালে তিন

(১) দয়ালচাঁদ বসাকের মোকদ্দমা, সনাতন কুণ্ডুর মোকদ্দমা, রসময় বসুর মোকদ্দমা।

কোটি টাকার বিলাতী কাপড় এদেশে আসিয়া বিক্রীত হয়। তুলার রপ্তানিও ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া যাইতেছিল। ৩৬ সালে ৩৮ লক্ষ টাকার তুলা যায়, ৪৬ সালে নয় লক্ষের অধিক রপ্তানি হয় নাই। ফলতঃ বিলাতীয় বণিকেরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য দ্বারা ঐ সময়ে বিশিষ্টরূপে লাভবান হইয়া এই দেশের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়েন, এবং এখানে রেলরোড প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগের স্থানে শতকরা ৪ টাকা বৃদ্ধি পাইবেন, এমত প্রমাণ গ্রহণ করেন। তাঁহারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ বাণিজ্যের প্রতিও হস্তক্ষেপ করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া ইংলণ্ডে অতি তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বুঝিতে হইলে লবণ বাণিজ্যবিষয়ক ইতিবৃত্ত অবগত হওয়া আবশ্যক।

মুসলমানদিগের অধিকারকালে লবণ-বাণিজ্য বিষয়ে এই নিয়ম ছিল যে, মুসলমান মহাজনদিগকে শতকরা ২॥০ টাকা এবং হিন্দু মহাজনদিগকে শতকরা ৫৲ টাকা শুল্ক প্রদান করিতে হইত। পলাসীর যুদ্ধের পর ইংরেজেরা কিছুকাল মহাজন মাত্রেরই স্থানে শতকরা ৩৲ টাকা শুল্ক এবং প্রতি খালাড়ী হইতে ৩৲ টাকা রাজস্ব লইতেন। ১৭৬২ সালে ঐ দুই প্রকার কর রহিত হইয়া প্রতি খালাড়ী হইতে ৩০৲ টাকা মাশুল আদায় করিবার নিয়ম হয়। ঐ সময়ে অর্থাৎ ১৭৬১ হইতে ১৭৬৫ সাল পর্য্যন্ত লবণের মূল্য শতকরা ৬০৲ টাকা হইতে ১৭০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অনন্তর ১৭৬৫ সালে ক্লাইব সাহেব যে 'বণিক সভা' সংস্থাপিত করেন, সেই সভা লবণ তামাক, পান এবং সুপারি, এই কয়েকটী দ্রব্যের একচেটিয়া করিয়া লয়। ঐ বাণিজ্য দ্বারা সভ্যদিগের লাভ প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টাকা হইত। ১৭৬৭ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখের পত্রের দ্বারা ডিরেক্টরেরা ঐ একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত করিয়া দিলে বাঙ্গাল কৌন্সিল প্রতি শত মণ লবণের উপর ৩০৲ টাকা মাশুল ধার্য্য করিয়া উহার দাম সিক্কা ১৪০৲ টাকার অধিক হইবে না, এরূপ নিরিখ বান্ধিয়া দিলেন। অনন্তর ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর জেনেরল হইয়া এই নিয়ম করি-

লেন যে, মলুঙ্গিরা যত লবণ প্রস্তুত করিবে তাহা গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কাহাকেও বিক্রয় করিতে পারিবে না, এবং মহাজনেরা পড়তা দর এবং গবর্ণমেণ্টের মুনফা দিয়া ছাড় লইবে। ইহাতে লবণকর প্রথমতঃ বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু নেমক মহলের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত ধনলোলুপ হইয়া এমত ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন, যাহাতে চোরাও লবণ অতিরিক্ত পরিমাণে বিক্রীত হওয়ায় কোম্পানির রাজস্ব ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া গেল। পরিশেষে ১৭৮০ সালে আইন প্রচারিত হওয়াতে উহাদিগের দৌরাত্ম্যের একপ্রকার নিবারণ হইল। কিন্তু তখন দেশীয় বড় বড় ধনী মহাজনেরা লবণ ক্রয় করিয়া উহা এত উচ্চদরে বিক্রয় করিতে লাগিলেন যে সাধারণ লোকে উহা ক্রয় করিতে পারিল না; সুতরাং কোম্পানির গোলা সকলে লবণ জমা হইতে লাগিল।

অনন্তর বিলাতীয় হাউস অব্ কমন্সের সিলেক্ট কমিটী হইতে এই পরামর্শ প্রদত্ত হইল যে, নীলাম করিয়া লবণ বিক্রয় করিবার প্রথা রহিত হইয়া বিদেশীয় লবণ দেশীয় লবণের সম পরিমাণ শুল্ক দিয়া বিক্রীত হইতে পারিবে। ৪৬।৪৭ সালে ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য হওয়াতে ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭ শত ৪৪ মণ বিলাতীয় লবণ এদেশে বিক্রীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় বণিকেরা মনে করিলেন যে, যদি ইণ্ডিয়া কোম্পানি মলুঙ্গীদিগের দ্বারা লবণ প্রস্তুত করা বন্ধ করেন, তবে তাঁহারা আরও অধিক লবণ এদেশে আনিয়া বিক্রয় করিয়া যাইতে পারিবেন—তাহাতে ত তাঁহাদিগের নিজের লাভ আছেই; তদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় লোকদিগেরও সস্তা দরে লবণ পাওয়ায় বিস্তর উপকার হইবার সম্ভাবনা। (১) কিন্তু ইংলণ্ডীয় বণিকেরা যদিও উভয় পক্ষের লাভ দেখাইয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিতেন, তথাপি যে সকল শ্রীবৃদ্ধিকারী ইংরেজ এ দেশে আসিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয় পক্ষের লাভ দেখাইবার ভাণও করিতেন না। তাঁহাদিগের কার্য্যতৎপরতা অনেক স্থলেই ন্যায়পরতাকে অতিক্রম করিয়া

(১) কলিকাতা রিবিউ; আইল্ উইন সাহেব প্রণীত পুস্তিকা।

চলিত। তাহার একটি দৃষ্টান্ত তাৎকালিক বাঙ্গাল কোল কোম্পানির ব্যবহার। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কয়লার খণি লর্ড ময়রার অধিকার কালে জোন্স নামা একজন ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, এবং ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের স্থানে ৪০ হাজার টাকা ঋণ প্রাপ্ত হইয়া খনি হইতে কয়লা তুলিবার উপক্রম করে। অনন্তর ঐ খনি আলেকজাণ্ডর কোম্পানির হস্তগত হইয়া থাকে। ১৮৩৩ সালে আলেকজণ্ডরেরা দেউলিয়া হইলে বাঙ্গাল কোল কোম্পানি ঐ খনি সমস্তের অধিকারী হয়েন। ইহাঁরা ছলে বলে ঐ প্রদেশীয় অনেক ভূমি সম্পত্তি আপনাদিগের অধীন করিয়া কয়লার বাণিজ্য আপনাদিগের একচেটিয়া করিয়া লইলেন। কোন মহাজন অপর কাহার খনি হইতে কয়লা কিনিয়া আনিতে গেলে কোল কোম্পানির লোকেরা তাহাদিগের নৌকা দামোদরে ডুবাইয়া দিত। ফলতঃ কয়লার পড়্‌তা দর যদিও মণকরা দুই পাই এবং ঢোলাই খরচ সাত পয়সার অধিক ছিল না, তথাপি কোল কোম্পানি উহা একচেটিয়া করিয়া সাড়ে পাঁচ আনার ন্যূন মূল্যে বিক্রয় করিতেন না (১)।

নীলকর সাহেবেরাও অনেক স্থলে ঐরূপ তেজস্বিতাসহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যেই একজন স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে,"৪০ বৎসরাবধি এতদ্দেশীয় জমীদারবর্গকে কখন ভয় কখন প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ জন্মাইয়া ক্রমে ক্রমে নীলকরেরা সর্ব্বতোভাবেই স্বকার্য্য সাধন করিয়া তুলিয়া ছিলেন।—কত নীলকর যে ক্লাইব্ সাহেবের ন্যায় দোর্দ্দণ্ড এবং অসমসাহসিক কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, কত নীলকর যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় প্রাজ্ঞতা এবং একাগ্রতা সহকারে আপনাপন অধিকার দৃঢ়তর করিয়া লইয়াছিলেন, কত নীলকর যে এলেনবরার ন্যায় দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়া দুর্বৃত্ত প্রজাবর্গকে শাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছিলেন

(১) হক্সে সাহেবের পুস্তিকা, সুপ্রিম কোর্টে বেঙ্গল কোল্ কোম্পানীর লাইবেল সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা।

তাহা কে বলিতে পারে? (১) ফলতঃ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এদেশের রাজকার্য্য আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিলেন, তজ্জাতীয় অপরাপর লোকেও যে, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন ইহা মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তির লক্ষণ বলিলেও বলা যায়।

যাহা হউক হার্ডিঞ্জ সাহেবের অধিকার কালের মধ্যেই ভারতবর্ষীয় আর একটী স্বাধীন রাজ্য ইংরাজদিগের আয়ত্ত হইয়া যায়। ইংরাজদিগের ঐ রাজ্য গ্রহণের প্রণালী উহাঁদিগের পূর্ব্ব প্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন ছিল না। শিখদিগেরও রাজ্য নষ্ট হইবার প্রধান হেতু তাহাদিগের গৃহবিচ্ছেদ। মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইবার পরেই শিখদিগের দেশে অন্তর্ব্বিবাদের সূত্রপাত হয়। মৃত মহীপতির পুত্র এবং পৌত্র অচিরকাল মধ্যে লোকান্তর গত হয়েন। শিখ সরদারেরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয় এবং শিখ সৈনিকগণের মাহিয়ানা বন্ধ হওয়াতে তাহারা ইংরাজদিগের নিকট পূর্ব্ব গচ্ছিত ১৮ লক্ষ টাকা পাইবার উদ্দেশে শতদ্রুনদী পার হইয়া ফিরোজপুর নগর আক্রমণ করিতে আইসে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই শিখদিগের সহিত বিবাদ জন্মিবে এমত সম্ভাবনা করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও শিখ সেনার আক্রমণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে ইংরাজেরা এদেশীয় যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন তাহার কোনটীই শিখ রাজ্যের ন্যায় প্রবল ছিল না। অপরাপর রাজাদিগের মধ্যে কাহার কাহার সুশিক্ষিত সেনা মাত্র ছিল। কিন্তু ঐ সৈনিকেরা স্বদেশ অথবা স্বধর্ম্মহিতৈষা দ্বারা উত্তেজিত ছিল না। সুতরাং উহারা উৎসাহশীল ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া অনায়াসেই পরাভূত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শিখ সেনার প্রকৃতি তাদৃশ নহে। উহারা মহারাজ রণজিৎসিংহের যত্নে অতি উত্তম উত্তম ইউরোপীয় সেনানীগণের দ্বারা সুশিক্ষিত, বহুকাল স্বাধীনাবস্থায় থাকিয়া

নিজ জন্মভূমির প্রতি শ্লাঘাযুক্ত, অভিনব ধর্ম্মশাসনের বলে বিশ্বাসবন্ত এবং উৎসাহশীল, আর দেশের জল বায়ুর গুণে সবলকায় এবং তাহার অবস্থানের প্রভাবে যুদ্ধপরায়ণ এবং বীরপ্রকৃতিক হইয়াছিল। ফলতঃ শিখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজেরা ভারতবর্ষ মধ্যে এক অপূর্ব্ব শত্রুর সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। কিন্তু পরিশেষে উহাঁদিগের রাজনীতি এবং যুদ্ধ কৌশল উহাঁদিগকে বিজয়শ্রী প্রদান করিল এবং হার্ডিঞ্জ সাহেব রণজিৎসিংহের রাজধানীতে পদার্পণ করত তথায় নিজ অভিমত শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিয়া অনতিকাল মধ্যেই স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

শিখযুদ্ধের অবসানে হার্ডিঞ্জ বাহাদুর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া বার্ত্তাবহ বিভাগের সংশোধন বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে যেমন দুই পয়সা দামের টিকিট লাগাইয়া যেখানে সেখানে পত্রাদি পাঠাইতে পারা যায়, ওসময়ে ডাকের সেরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। দূরত্বের অনুসারে ডাকের মাসুল অধিক বা অল্প লাগিত। ওরূপ নিয়ম থাকায় লোকের অনেক অসুবিধা হইত। যতদিন ইংলণ্ডেও ঐ প্রকার ব্যবস্থা ছিল ততদিন কোন কথা হয় নাই। কিন্তু ১৮৪০ অব্দ হইতে ইংলণ্ডে ডাকের মাসুল সর্ব্বত্র সম পরিমাণ হইয়াছিল; সুতরাং ঐ প্রণালীর সুবিধা ইংরাজদিগের অনুভব হওয়াতে ভারতবর্ষ প্রচলিত নিয়মের অসুবিধা অধিকতর স্পষ্টরূপেই অনুভূত হইতে লাগিল। কিন্তু হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ইহার কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিবেন এই কথার সূত্রপাত করিয়াছিলেন মাত্র।

হার্ডিঞ্জ বাহাদুর তাঁহার সজাতীয়দিগের নিকট বড় প্রশংসাভাজন হইতে পারেন নাই। ইংরাজ জাতি আমাদিগের "ফলারে" দিগের ন্যায় কিছু অধিক মিষ্টান্ন প্রিয়। কোন গবর্ণর সাহেবের যতই কেন অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণ থাকুক না কেন, যদি তিনি মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট ভোজ না দেন তাহা হইলে কখনই ইংরাজদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারেন না। হার্ডিঞ্জ বাহাদুর যে সকল খানা দিতেন তাহা ইংরাজদিগের মনের মত

হইত না। ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর এলেন্‌বরা বাহাদুরের ঐ গুণটী বিলক্ষণ ছিল। এইজন্য তিনি সকলের প্রতি অত অনাদর করিয়াও এদেশবাসী ইংরাজগণের তেমন বিরাগ ভাজন হয়েন নাই। আমরা যেমন বলিয়া থাকি 'পেটে খেলে পিঠে সয়' ইংরাজেরাও কাজে তাহাই করিয়া থাকেন। ইংরাজদিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে ভোজ দেওয়া।

এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান ব্যক্তিরা অনেকেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। এবং কেহ কেহ তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্ব্বাপেক্ষায় ইহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনেক গুলি মহৎ গুণ ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত গুণ সত্ত্বেও যদি তিনি তেমন করিয়া ইংরাজদিগের সহিত না মিশিতেন এবং তাঁহাদিগকে তেমন করিয়া ভোজ না দিতেন তাহা হইলে কখনই ইংরাজ জাতির তত সমাদরের পাত্র হইতে পারিতেন না। যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মরণার্থ কোন চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখিবার নিমিত্ত কলিকাতার টৌনহলে একটী সভা হয়। ঐ সভায় রাজধানীর প্রধান প্রধান যাবতীয় ইংরাজ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রশংসাসূচক অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা সমস্ত করিয়া ছিলেন। পরিশেষে এই স্থির হয় যে, চাঁদা দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিয়া কোম্পানির কাগজ করা হইবে এবং তাহার সুদ হইতে খরচ দিয়া এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগকে বিলাতে অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করা হইবে। ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। না হইবার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু একটী কারণ এই, ও সময়ে ইউরোপীয় সওদাগরদিগের মধ্যে বড়ই বিভ্রাট পড়িয়াছিল। ইউরোপ খণ্ডের সকল দেশেই রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। হঙ্গারি এবং পীড্‌সণ্টের বিদ্রোহে অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য যায় যায় হইয়া পড়ে। ফ্রান্সের মধ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার উপক্রম হয়। জর্ম্মনির প্রজাগণ অনেক উপদ্রব করিয়া পরিশেষে একটী পার্লিয়ামেণ্ট সভা সংস্থাপিত করাইয়া লয়। আইর্লণ্ড দ্বীপে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে

পক্ষ দেখা দেয় এবং নিজ ইংলণ্ডের মধ্যেও প্রজাতন্ত্রতার পক্ষপাতী দলের এতদূর সাহস হয় যে, সৈনিক বলের দ্বারা সেই সাহস ভঞ্জন করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে। এমত সমূহ উপদ্রবের সময় বাণিজ্য কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছিল এবং সেই ব্যাঘাতে কলিকাতায় অনেক হৌস দেউলিয়া হইয়া যায়। টাকার বাজারও এত গরম হইয়া উঠে যে অন্য দেশের কথা দূরে থাকুক ইংলণ্ডেই সুদ শতকরা ৮ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। সুতরাং, আর কোন কাজই সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক চলিল না। রেইলওয়ে হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু ও সময়ে শতকরা ৫ টাকা সুদের লোভে কে রেইলওয়েতে টাকা দিতে যাইবে?

অতএব ঐ সময়ে বাঙ্গালায় বিশেষ কোন কাজই হয় নাই। রেইলওয়ের পত্তন শীঘ্র শীঘ্র করাইতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিতে হইবে, ডাকের বন্দোবস্ত উৎকৃষ্টতর করিতে হইবে, পুলিসের জঘন্য দশা দূর করিতে হইবে, হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ দেওয়াইতে হইবে, কৌলীন্য প্রথার উচ্ছেদ করিতে হইবে, রাজকর্ম্মচারী এবং রাজধানীস্থ সম্ভ্রান্ত প্রজাদিগের মধ্যে এই সকল কথারই যথেষ্ট আন্দোলন হইয়াছিল। কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এদেশীয়দিগের দুশ্চরিত্রতা সংশোধন করিবার উপায় কি, 'বর্ণভেদ প্রথার দোষ কি' এমত সকল বিষয়ে প্রস্তাব লিখিবার জন্য পারিতোষিক স্বীকার করিতেন এবং কৃতবিদ্যদল এবং ইংরাজ পাদরীরা ঐ সকল বিষয়ে প্রস্তাব লিখিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা ঐ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই।

কিন্তু তাহা না হইলেও ঐ সময়টি যে নিতান্ত ব্যর্থ গিয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। ঐ সময়ে ইংরাজেরা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে সমুদায় ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের করতলস্থ হইল। যে এক শিখ জাতি তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষ এবং দেশীয় জনগণের গরিমাস্থল ছিল আর তাহাও নাই সুতরাং যুদ্ধকার্য্যের বিরাম হইল। এক্ষণে রাজ্যের সুশাসন কিরূপে হয় এদেশীয় লোকেরা কিরূপে ইংরাজদিগের চিরবশীভূত থাকে এবং

কিরূপ করিলেই বা সমুদায় সাম্রাজ্যটী আঁটা সাঁটা হইয়া দাঁড়ায় তাহার প্রতিই বিশেষ যত্ন পড়িল।

হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের সময়ে ঐ যত্ন বাক্যমাত্রেই প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই সকল বাক্যে ইংরাজ জাতির যৎপরোনাস্তি উদারতাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। সাম্রাজ্যের সুশাসন প্রণালী উদ্ভাবন করা প্রজাব্যূহকে ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া সর্ব্বতোভাবে ইংরাজী প্রণালীর পক্ষপাতী করা এবং ইংলণ্ড দেশে যে যে উৎকর্ষ বিধান হইতেছে ভারতবর্ষকেও সেই সকল উৎকর্ষের অধিকারী করা তাৎকালিক রাজপুরুষদিগের উদ্দেশ্য হইয়াছিল।

হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সাম্রাজ্যকে এই উদারতর ভাব পরিগ্রহ করাইয়া ১৮৪৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

লর্ড ডাল্‌হৌসি।

লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য গ্রহণ করেন। ইহাঁকে পূর্ব্বে একবার বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণরি দিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু ইনি সেই পদ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে গবর্ণর জেনেরেল হইয়াই আসিলেন।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত হইয়া আসিয়াছে, ডালহৌসি সাহেব তাঁহাদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বাগ্রগণ্য পুরুষ। তিনি ক্লাইবের ন্যায় যুদ্ধবীর না হউন, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ না হউন, ওয়েল্শ্লীর ন্যায় উন্নতবুদ্ধি এবং উদারাশয় না হউন, এবং কর্ণওয়ালিসের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ অথবা বেণ্টিকের ন্যায় নরকুল-হিতৈষী না হউন, কিন্তু বিলক্ষণ তীক্ষ্ণধী তেজস্বী এবং উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

ডাল্‌হৌসি একজন বড়লোক ছিলেন। তবে বড়লোকের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। কোন বড়লোক এরূপ হন যে, তিনি কাল-গতিক পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া যদি তাহা অন্যায্য পথে যাইতেছে দেখেন, তবে তাহা সবলে ফিরাইবার চেষ্টা পায়েন। আর এক প্রকার বড়লোক এরূপ যে, তিনি কালগতিক বুঝিয়া লইয়া আপনিও সেই গতির অনুক্রমে চলিতে থাকেন, কিন্তু তাহা কেমন পথে যাইতেছে তাহার বিচার করেন না। অপর একপ্রকার বড়লোক এরূপ যে, তিনি কালগতিক মাত্র বুঝিয়া সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়া যান। সে সুপথে কি কুপথে লইয়া যাইতেছে তাহার ত বিচার করেনই না, নিজেও বড় একটা বল প্রয়োগ করেন না, সুখে স্বচ্ছন্দে স্রোতোবেগে চলিয়া যান মাত্র। ডালহৌসি এই তিন প্রকার বড়লোকের মধ্যে প্রথম দলস্থ নহেন। তিনি কালগতিককে ন্যায্য পথে

আনয়ন করিবার নিমিত্ত কোন চেষ্টাই করেন নাই। তিনি তৃতীয় প্রকারেরও লোক ছিলেন না। কারণ তাঁহার স্বাভাবিক তেজস্বিতা এত অধিক ছিল যে, তিনি গা ভাসান দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি দ্বিতীয় প্রকারের লোক ছিলেন। তিনি কালগতিক বুঝিয়াছিলেন এবং সেই অভিমুখে সবলে চালন করিয়া সাম্রাজ্যরূপ তরীকে এত অগ্রবর্ত্তী করিয়া আনিয়াছিলেন যে, পশ্চাদ্বর্ত্তী স্রোতোবেগ তাহার উপর পতিত হইয়া অতি ভয়ঙ্কররূপেই তাহাকে আঘাত করিয়াছিল।

যাহা হউক, প্রথমে ওরূপ কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নাই। ডাল্‌হৌসি গবর্ণর হইয়া আসিলে পূর্ব্বের ন্যায়ই সকল কার্য্য চলিতে লাগিল। তখন কলিকাতার বণিকদলের মধ্যে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল (১)। অনেক বড় বড় হৌস্ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল (২)। বিশেষতঃ ১৮৪৫।৪৬ অব্দে বৈদেশিক বাণিজ্যপোতের প্রতি যে অধিক মাসুল আদায় করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য অনেক ফরাসী এবং গ্রীক্ হৌসের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছিল। অতএব সেই অতিরিক্ত শুল্কগ্রহণ প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইল (৩)। বাস্তবিক এক দেশের বণিক্‌পোত হইতে অল্প এবং আর এক দেশের বণিকপোত হইতে অধিক শুল্ক গ্রহণ করিবার নিয়ম অতি দুষ্ট নিয়ম। ইংলণ্ডে ঐ নিয়ম থাকাতে ভারতবর্ষীয় চিনির বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইয়া আসিয়াছিল। অনন্তর ১৮৩৬।৩৭ অব্দ হইতে ঐ অতিরিক্ত শুল্ক গ্রহণের প্রথা উঠিয়া গেলে আবার ক্রমে ক্রমে চিনির রপ্তানি বর্দ্ধিত হইয়া এমন দুর্ব্বৎসরেও প্রায় সওয়া সতর লক্ষ মণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, ডাল্‌হৌসি সাহেব ইংলণ্ডীয় প্রধান রাজমন্ত্রী পীল মহোদয়ের শিষ্য ছিলেন এবং স্বয়ং ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য সভার

(১) ১৮৪৬।৪৭ অব্দের আমদানি ৬,৪৭,৩৩০০০ ঐ রপ্তানি ৯,৭৮,৮৫০০০। ১৮৪৭।৪৮ অব্দের আমদানি ৫,৩৯,৮১০০০ ঐ রপ্তানি ৮,৬৩,৭৫০০০।—কমর্শল আনুয়াল।

(২) ২০টা হৌস্ ঐ সময়ে দেউলিয়া হয়।—ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া।

(৩) ১৮৪৮ অব্দের ৬ আইন।

সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। অতএব তিনি যে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যেরও অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা সম্পাদন করিয়া দিবেন তাহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু ঐ সময়ে আর একটী আইন প্রচলিত হইয়া জমীদারদিগের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। সে আইনটী ঠিক ডালহৌসির মতের অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। প্রজাদিগের উপর জমীদারদিগের অধিকার এক প্রকার অপরিসীম হইয়াছিল বলিলেই হয় এবং ঐ সময়ে প্রজাদিগের অবস্থাও নিতান্ত নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি জমীদারেরা প্রার্থনা করায় এরূপ বিধি হইল যে, জমাবৃদ্ধির নোটিস প্রজার হাতে হাতে না দিলেও চলিবে (১)। এইরূপ দুই একটী আইন হইতেছে এবং ডেপুটী গবর্ণর লিটনার সাহেবকে সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রদানের সমারোহ হইতেছে এবং হিন্দু কলেজে খৃষ্টান শিক্ষক থাকিতে পাইবে কি না তাহার বিচার হইতেছে, এমত সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে গোলযোগ উপস্থিত হইল। ডাল্‌হৌসি শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন এবং স্যর হর্বর্ট মাডক্ সাহেব বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর হইয়া কলিকাতায় থাকিলেন।

ডালহৌসির সময়ে কি জন্য এবং কিরূপে শিখদিগের সহিত যুদ্ধ হইল তাহা সবিস্তার বর্ণন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। শিখেরা বীরধর্ম্মা। তাহাদিগের সর্দ্দারেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া আত্মবিচ্ছেদ দ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছিল বলিয়াই ইংরাজেরা তাহাদিগকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন— বিজিত হইয়াও তাহাদিগের মনে মনে এই সংস্কার ছিল। সুতরাং যখন তাহারা দেখিল যে, ইংরাজেরা শাসন কর্ত্তৃত্বে প্রবেশ করিয়া একেবারে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন তখন তাহারা আপনাদিগকে নিতান্ত অবমানিত জ্ঞান করিল। বিশেষতঃ ইংরাজের শাসন বড়ই চাঁচাছোলা জিনিস। অমুক সরদার অমুক প্রদেশের বা অমুক কিস্তির রাজস্ব দিলেন না বা অমুক সালের হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না, এরূপ করিলে তাঁহারা চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা সকল বিষয়ের বিশেষতঃ খরচ পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ইহাতেও শিখ সর-

(১) ১৮৪৮ অব্দের ৮ আইন।

দারেরা বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল যে, মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময়েও তাহাদিগের যে স্বাধীনতা এবং যে অধিকার ছিল, ইংরাজ প্রভুতায় তাহাও থাকিবে না। আর রণজিতের মৃত্যুর পর তাহাদিগের কেহই দমনকর্ত্তা ছিল না; আপনারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত। অতএব ইংরাজপ্রভুত্ব তাহাদিগের দুঃসহ হইয়া উঠিল। কোন কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীও এরূপে চলিতেছিলেন, তাহাতে পঞ্জাবনিবাসী মুসলমান প্রজাবর্গ শিখ আধিপত্যের বিরূপ হইয়া দাঁড়ায় (১)। এসকল লক্ষণেও শিখদিগের বোধ হইল যে, ইংরাজেরা আর আমাদিগকে মাথা তুলিতে দিবেন না। এইরূপ নানা কারণ মনে মনে আন্দোলন করিয়া শিখ সরদারেরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

তাহারা যুদ্ধও মন্দ করে নাই। মূলতানে মূলরাজ, চন্দ্রভাগা এবং ঐরাবতীর মধ্যভাগে শেরসিংহ, আর পেশাবর প্রদেশের সমীপে ছত্র সিংহ—এই তিন জনে বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য, এবং সাহসিকতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ইংরাজকেও অন্ধকার দেখিতে হইয়াছিল। বিলাত পর্য্যন্ত হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ অত্রত্য সেনাপতির প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা (২) প্রকাশ করিয়া মহাবীর স্যর চার্লস নেপিয়র সাহেবকে সৈন্যাপত্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠান।

কিন্তু নূতন সেনাপতি ঐস্থলে উপস্থিত না হইতে হইতেই শিখগর্ব্ব খর্ব্ব হইল। শিখ সরদারেরা পরাজিত হইয়া ইংরেজদিগের কবলিত হইলেন। রণজিৎ সিংহের পাটেশ্বরী রাণী চন্দ্রাবতী কারাবরুদ্ধা হইলেন এবং রণজিৎ সিংহের পুত্র কুমার দলিপ সিংহ ইংরাজদিগের প্রদত্ত বৃত্তি স্বীকার পূর্ব্বক পিতৃরাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া একজন পাদ্রির নিকট বিদ্যাভ্যাসার্থ নিযুক্ত হইলেন।

এই শিখ যুদ্ধের জয় অবধি ডালহৌসি বাহাদুরের সঙ্কল্প হইল, ভারত-

(১) কর্ণেল ইবান্স বেল সাহেবের গ্রন্থ।

(২) সেনাপতি গফ্ সাহেব কোন কর্ম্মের লোক নহেন এই কথা বলিয়া ডিউক অফ্ ওয়েলিংটন ডিরেক্টর সভার পত্র লেখেন।

বর্ষে আর স্বাধীন রাজ্য থাকিতে দিবেন না। (১) তিনি স্থির করিলেন যে, ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজ্যগুলি ইংরাজ রাজতার দৌর্ব্বল্যের হেতু। যতদিন ওগুলি থাকিবে ততদিন নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যের অন্তঃশাসন সুনির্ব্বাহিত করিতে পারা যাইবে না। তিনি ভাবিলেন, এই আমি কলিকাতায় বসিয়া বাণিজ্য, পুলিস, জেল সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সকলের দোষ গুণ বিচার করিতেছিলাম; হঠাৎ শিখেরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আকুণ্ড কুণ্ড বাধাইয়াছিল। অতএব যাহাতে আর ওরূপ গোলযোগের কারণ না থাকে, আমাকে সর্ব্বাগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২)

সেই ব্যবস্থা বাহির হইল। ডালহৌসি সাহেব বলিলেন যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন, অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব সম্রাট্‌দিগের যে অধিকার ছিল ইংরেজদিগের সেই সমস্ত অধিকার হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে, কোন রাজা অথবা নবাব কিম্বা সুবাদার কোন প্রদেশের অধিকার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিতেন এবং বিনানুমতিতে সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিতেন না। এখন অবধি সেই নিয়ম প্রচলিত হইবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ প্রাদেশিক অধিকার গ্রহণে সমর্থ হইবেন না। দত্তক এবং পোষ্যপুত্র লইবার বিষয়েও ঐ ব্যবস্থা চলিবে। এই ব্যবস্থায় বিলাতীয় কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগেরও অভিমতি হইল।

না হইবে কেন? সমস্ত ভারতবর্ষই যে ক্রমে ক্রমে ইংরাজদিগের আয়ত্ত হইয়া যাইবে, তাহার অনেকানেক লক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। রাজনীতি বিশারদ ইংরাজেরাও তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন। এদেশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগের মধ্যেও ঐ সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। (৩) এমত অবস্থায় ডালহৌসি সাহেব ঐ ব্যবস্থা বাহির

(১) জাকসন সাহেবের প্রণীত গ্রন্থ।

(২) পার্লিয়ামেণ্টে হিউম সাহেবের বক্তৃতা।

(৩) মণিপুর রাজামাত্যের পত্র।

করিয়া অনায়াসেই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করিলেন। আমাদিগের বিবেচনায় ঐ ব্যবস্থা বাহির করায় রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য হয় নাই। উহা কার্য্যগতিকেরই অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। তবে এই বোধ হয় যে উহার প্রয়োগটী একটু ধীরভাবে করিলেই ভাল হইত। কিন্তু ডালহৌসি অল্পবয়স্ক (১) তাহাতে নিতান্ত তেজস্বী এবং ক্ষিপ্রকর্ম্মা। সুতরাং কালাত্যয় করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। ইংরাজাধিকার এপর্য্যন্ত যাহা গ্রাস করিতেছিল, তাহা যেন একটু একটু চর্ব্বণ করিয়াই গলাধঃকরণ করিত, তাঁহার সময়ে আর চর্ব্বণের অবকাশ রহিল না; গোটা গোটা স্বাধীন রাজ্য একেবারে গিলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে ইংরাজাধিকার যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ওরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োগ হয় নাই। ভারতবর্ষের লোকদিগের চিরসংস্কার এই যে, রাজা যুদ্ধ করিয়া আপনার রাজ্য বিস্তার করিবেন তাহাতে দোষ নাই। বরং তাঁহারা ইহাই জানেন যে, রাজা অধিকার বিস্তারে ক্ষান্ত হইলেই নষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব কোন রাজা যে কখন পররাজ্যের প্রতি লোভপরিশূন্য হইয়া বজায় থাকিতে পারেন এদেশের লোকেরা তাহা সহজে বিশ্বাসই করে না। ওয়েলস্‌লি অনেক রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকারসম্ভুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার অধিকার বিস্তার, সংগ্রাম জয়ের পরবর্ত্তী ব্যাপার হইয়াছিল। ডালহৌসিও ঐরূপ যুদ্ধ করিয়া পঞ্জাব হস্তগত করিলেন। তাহাতে এদেশীয়েরা কিছু মনে করিল না। তিনি রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিলেন। এই মাত্র অনুমান করিল। কিন্তু যখন ব্যবস্থা বাহির করিয়া স্বাধীন রাজ্য সমস্তের অধিকার গ্রহণ করা হইতে লাগিল, দত্তক গ্রহণ নিবারণ পূর্ব্বক জায়গীর সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বপ্রদত্ত পেন্সন সমূহের ক্রমশঃ লোপ করা হইতে লাগিল, তখন আর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি রহিল না। ভারতবর্ষের লোকেরা যতই কাপুরুষত্ব প্রাপ্ত

(১) লর্ড ডালহৌসী যখন গবর্ণর জেনারেল হন, তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। (ডিউক অফ্ আর্গাইলের পুস্তক)।

হইয়া থাকুক, ইহারা চিরকাল সরল বীরধর্ম্মের পক্ষপাতী। এখনও পুরাণ শাস্ত্রোক্ত লোকোত্তর সাহসিকতা এবং অস্বার্থপরতা ইহাঁদিগকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব ইহাঁরা কলমের বলে রাজ্য লওয়ার প্রণালী বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, এতদিনের পর ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সরল ব্যবহার এবং বীরধর্ম্ম পরিহার করিয়া নীচপ্রকৃতিক কৌশলের অবলম্বন আরম্ভ করিলেন। এতদিনের পর তাঁহারা মিথ্যা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অভ্যন্তরে ওরূপ কোন পরিবর্ত্তই ঘটে নাই। পূর্ব্বেও যাহা হইয়া আসিয়াছিল, এখনও তাহাই হইতেছিল মাত্র। পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের মানচিত্র ইংরাজ অধিকার চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রক্তিমাভ ধারণ করিতেছিল, এক্ষণেও তাহাই করিতে লাগিল। তবে কিছু শীঘ্র শীঘ্র হইতে লাগিল এইমাত্র ভেদ। ডালহৌসির সাহজিক ক্ষিপ্রকারিতা ভিন্ন ওরূপ সত্বরতায় আরও একটী কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৪৭।৪৮ অব্দে সমুদায় ইউরোপ খণ্ডের রাজনীতিতে একটী বিশেষ পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যায়। সর্ব্বত্রই রাজা এবং ভূম্যধিকারি দলের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া রাজ্য সমস্ত দৃঢ়তররূপে সম্বদ্ধ এবং প্রজাব্যূহের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়। ভারতবর্ষের লোকেরা ঐ সকল পরিবর্ত্তের বিষয় কিছুই জানিতেন না সত্য, কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষেরা নিরন্তর ঐ সকল ঘটনার বিবরণ পাঠ করিতেন, এবং তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেন। অতএব তাঁহারাও যে কিয়ৎ পরিমাণে রাজনীতি সম্বন্ধে ঐ সকল অভিনব মত গ্রহণ করিবেন এবং যত সম্ভব সেই মতানুযায়ী কার্য্য করিবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বন্ধন দৃঢ় করিতে হইলেই স্বাধীন রাজ্যগুলির লোপ করা আবশ্যক হয়। অতএব সেই দিকেই মন প্রধাবিত হইল। ঐ সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের মুখ হইতে এরূপ কথাও মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে লাগিল যে, এতদ্দেশীয় প্রজাসাধারণের উপকার সাধন করাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুখ্য কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহা সাধন করিবার নিমিত্ত যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগকে, কি ভূম্যধিকারীদিগকে

কি বৃত্তিভোগিবর্গকে অপদস্থ এবং নিরাশ করিতে হয় তাহা করাও অবিধেয় নহে। কিন্তু এই সকল কথা তখন দেশময় রাষ্ট্র হয় নাই। যাঁহারা ওসকল কথা বলিতেন তাঁহারাও যে সকলে সকল সময়ে ঐ সকল মত বজায় রাখিয়া চলিতেন, এমত নহে। তবে যে সময়ে এবং যেরূপে ঐ রাজনীতিটীর প্রথম উৎপত্তি হয়, তাহা যথাকালেই বলা হইল। উহা ডালহৌসি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর টমসন সাহেবের দ্বারাই তৎপ্রদেশে অতি সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক প্রচারিত হয়। অনন্তর পঞ্জাব প্রদেশের প্রধান কমিসনর স্যর্ জন্ লরেন্স সাহেবও ঐ মতানুসারে পঞ্জাব প্রদেশের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ঐ রাজনীতির বল এখনও ন্যূন হইয়া যায় নাই। যাহা হউক, যে সময়ে ডাল্‌হৌসি শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন সেই সময়ে কলিকাতায় জালরাজা প্রতাপচন্দ্রকে লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তি শিখ এবং নেপালীদিগকে সহায় করিয়া ইংরাজদিগের রাজ্য গ্রহণ করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে এরূপ প্রবাদ উঠিল। তাহাকে অমনি গ্রেফ্‌তার করিয়া জেলে দেওয়াও হইল। বাস্তবিক ঐ সময়ে নেপালীয়েরা স্বপ্নেও ইংরাজদিগের অধিকার আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টা করে নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকার নিতান্ত অস্থায়ী এই ভাবটী ইংরাজদিগের মনে চিরজাগরূক; অতএব তাঁহারা অতি অল্পেই ঐরূপ ভয় পাইয়া থাকেন। দার্জিলিঙ্গ নিবাসী ইংরাজেরাও ঐ সময়ে সিকিম রাজ্য হইতে আক্রমণের শঙ্কা করিয়া মহা ভীত হইয়াছিলেন।

কিন্তু ঐ সকল পরদেশীয় রাজার আক্রমণের ভয় অপেক্ষা বাঙ্গালা নিবাসী ইংরাজদিগের আর একটি বড় অপূর্ব্ব ভয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বদাই শঙ্কা করিতেন যে, কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করিবেন। এই বিষয়টি একটু বিশেষ করিয়া না বলিলে বুঝিতে পারা যাইবে না। কলিকাতার সুপ্রীম্ কোর্টে এবং সদর দেওয়ানী ও তদধীন যাবতীয় কোর্টে একপ্রকার পরস্পর বিদ্বেষ ভাব ছিল। মফস্বলে কোন আদালত যদি কোন নীলকর বা কোন সওদাগর সাহেবের প্রতি

হস্তার্পণ করিতে যাইতেন, অমনি ঐ আদালতের বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে নালিস হইত, এবং ঐ নালিসের খরচার দায়ে বিচারপতি পীড়িত হইতেন। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ঐ সময়ে এমত নিয়ম করেন যে, সুপ্রীম কোর্টের খরচার টাকা সরকার হইতেই দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিয়া রাখিয়াছিলেন যে,সুপ্রীম কোর্টের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সে মোকদ্দমা আর কোম্পানীর কোন আদালত গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ওরূপ কোন নিয়ম করেন নাই। যে মোকদ্দমা কোম্পানীর আদালতে রুজু আছে তাঁহারা সে মোকদ্দমা আপনারা বিচার করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতেন। এই সকল কারণে কোম্পানীর আদালতগুলি বিলক্ষণ অবমানিত ও হীনবল হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইংরাজেরা কোম্পানীর আদালতের অধীন ছিলেন না এবং ঐ সকল আদালতের কোন তুয়কাই করিতেন না। এক দেশের মধ্যে থাকিয়া কতকগুলি প্রজা এক আদালতের অধীনে এবং কতকগুলি তাহার অধীনে নয় এরূপ ব্যাপার সহজেই নিতান্ত বিসদৃশ। তাহাতে আবার অনেক ইংরাজ মফঃস্বলে থাকিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি নির্ব্বাহ করেন, এদেশীয়দিগের সহিত সকল প্রকার কারকারবার করেন অথচ এদেশীয়েরা যে আদালতের অধীনে সে আদালতকে মান্য করেন না,এরূপ হওয়াতে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে। অতএব সেই সকল বিশৃঙ্খলা নিবারণকরিবার উদ্দেশে কয়েকটি ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় (১)। তাহার একটি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, মফস্বলের বিচারপতিদিগের উপর সুপ্রীম কোর্টে নালিস চলিবে না। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য্য এই যে, মফঃস্বলের ফৌজদারী আদালতে ইংরাজদিগের বিচার হইতে পারিবে। তৃতীয়টির উদ্দেশ্য এই যে ফৌজদারী বিচারে জুরির আহ্বান করা বা না করা আসামীর এক্তিয়ারে থাকিবে।

এই পাণ্ডুলিপি প্রচারিত হইবা মাত্র কলিকাতা নিবাসী ইংরাজদিগের মধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। টৌনহল গৃহে সভা হইল এবং কোম্পানী

(১) বেথুন সাহেবের ব্লাক্ আক্ট।

বাহাদুর এবং ব্যবস্থাপক মহাশয়ের (১) উপর অজস্র গালিবর্ষণ হইল। স্বাধীন ইংরাজেরা এবং ফিরিঙ্গীরা ঐ সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিতে লাগিলেন। এবং দেশীয় লোকেরা ঐ ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি উভয়দলের একান্ত বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল (২)।

বাস্তবিক কোম্পানীর আদালত সকলের অবস্থা কিছু ভাল ছিল না। যে সকল সিবিলিয়ান সাহেব মফস্বলের আদালতে নিযুক্ত হইতেন তাঁহারাও বিচার কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়া ঐ সকল পদ পাইতেন না। তাঁহারা "মাথা কেটে কামান শিক্ষা" করিতেন। তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের কুটুম্ব স্বজন বলিয়াই হেলিবুরি কলেজে ভর্ত্তি হইতেন, পরে সেখানে যাহা কিছু শিখিয়া কলিকাতায় আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছু দিন থাকিতেন, পরে পণ্ডিত এবং মুন্সিদিগের সহায়তায় দেশীয় ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মফঃস্বলে গিয়া বিচারপতি হইয়া বসিতেন। এরূপ অনভিজ্ঞ বিচারপতিদিগের দ্বারা কখনই বিচারকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইত না। আমলাদিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল এবং জুয়াচুরি ও মিথ্যা সাক্ষ্যের স্রোত বহিত। কিন্তু এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেট হাকিমরা ত অল্পবয়স্ক লোক। জিলার জজ সাহেবেরা অপেক্ষাকৃত অধিক বহুদর্শী হইয়াও বিচার কার্য্যে বিশেষ পটুতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে সদর দেওয়ানি আদালতে যত মোকদ্দমার আপীল হইত তাহার মধ্যে জিলার জজ সাহেবদিগের কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন মোকদ্দমায় আপীলের সংখ্যা সদর আমিন আদালতে নিষ্পন্ন মোকদ্দমার আপীল অপেক্ষা তিন গুণ অধিক হইত। অথচ সদর আমী-

(১) ব্যবস্থাপক মহাত্মা বেথুন সাহেব বিলাত হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আইসেন যে, ভারতবর্ষে যত টাকা রোজগার করিবেন এক পয়সাও ইংলণ্ডে আনিবেন না। সেনাপতি ল্যমার্টিনিয়র, ডেবিড হেয়ার এবং বেথুন সাহেব এই তিন জনে এতদ্দেশীয়দিগের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ।

(২) বাবু রামগোপাল ঘোষের পুস্তিকা। এগ্রিকলচুরেল সভা হইতে তাঁহার পদচ্যুতি।

দেরা জজদিগের অপেক্ষা অন্যূন পাঁচগুণ অধিক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। ফলতঃ দেশীয় লোকের দ্বারাই বিচার কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে, বিদেশীয়দিগের দ্বারা তাহা কদাপি হইতে পারে না। বিদেশীয়গণ যতই বুদ্ধিমান যতই বিদ্বান হউন না কেন, তাঁহারা কখনই বাদী প্রতিবাদীর এবং সাক্ষীদিগের প্রকৃত মনের ভাব স্বদেশীয় বিচারপতির ন্যায় বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। মফস্বলের আদালত সকল এইরূপ, সদরের অবস্থাও প্রশংসনীয় ছিল না। সদর আদালতের এই নিয়ম ছিল যে, একজন মাত্র বিচারপতি কোন্ আপীল গ্রাহ্য কোন্ আপীল অগ্রাহ্য তাহার বিচার করিবেন। আপীল অগ্রাহ্য করাতেই বিচারকর্ত্তাদিগের সুবিধা। অনেক আপীলই অগ্রাহ্য হইত। শুদ্ধ তাহাই নহে, ১৮১৪ অব্দে একটি ব্যবস্থা হয় যে, আদালত বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইলে যে সকল উকীল অনর্থ মোকদ্দমা বাধাইয়াছেন এমত উকীলদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন। সদর আদালতের জজেরা ঐ নিয়মের বলে সাত জন উকীলকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ফলকথা ঐ সময়ের জজেরা আপীল গ্রাহ্য করিতেন না, এবং যদি নিতান্তই দায়ে পড়িয়া গ্রাহ্য করিতেন তবে অনেকস্থলেই নিম্ন আদালতের রায় বাহাল করিয়া যাইতেন। এই জন্য কোন কোন জজের "বাহালী জজ" বলিয়াই খেতাব উঠিয়া গিয়াছিল। সদর আদালতের এই দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত নিয়ম হইল যে, কোন্ আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য তাহার বিচার ফুলবেঞ্চে হইবে। তাহা আর একজন জজের অধীন থাকিবে না।

ঐ সময়ের পুলিসের অবস্থাও ভাল ছিল না। মফস্বলের পুলিসের ত কথাই নাই। জমীদারে জমীদারে (১) সর্ব্বদাই লাঠিয়াল লইয়া যুদ্ধ চলিতেছিল। ডাকাইতিও (২) কলিকাতার ২০।২৫ ক্রোশের মধ্যে বৎসরে সওয়া শতের কম হইত না। রাজধানীর মধ্যেও পুলিসের অবস্থা অতি অপকৃষ্ট ছিল। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের

(১) রাজা রাধাকান্ত, রতন রায় এবং বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর মোকদ্দমা।

(২) চুঁচুড়ায় মাধবদত্তের বাটীতে, শ্রীরামপুরে দে-দিগের বাটীতে।

স্থানে সমূহ ঋণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের একান্ত বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল দোষের প্রতীকার করিবার অভিপ্রায়ে একটি পুলিস কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল।

রাজধানীর এবং অন্যান্য নগরের স্বাস্থ্য এবং শোভা সম্বর্দ্ধন করাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে চেষ্টা হইত কিন্তু ঐ সকল চেষ্টায় কোন বিশেষ ফল দর্শে নাই। কলিকাতার মিউনিসিপল কমিশনরেরা আপনাদিগের খরচের উপযুক্ত টাকা আদায় করিতে পারিতেন না। তাঁহারা যদি গৃহস্বামীদিগের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বসাইতে যাইতেন তবে দেশীয় লোকের বিরাগভাজন হইতেন। যদি ঘোড়ার উপর ট্যাক্স তুলিতে যাইতেন তাহা হইলে ইউরোপীয় অধিবাসীদিগের ক্রোধের ইয়ত্তা থাকিত না। আর মফস্বলে যে আইন (১) প্রচলিত ছিল তাহার নিয়ম এই যে, নগরের দশ আনা লোক সম্মত হইলে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ট্যাক্স বসাইতে পারিবেন তাহা প্রায় কোন স্থানেই হইয়া উঠিত না। সুতরাং ঐ আইন থাকা না থাকা সমান হইয়াছিল। এই সকল কারণে এবং কোথাও কোথাও প্রজাদিগের সহিত মাজিষ্ট্রেটদিগের (২) তুমুলবিবাদ উপস্থিত হওয়ায় আর একটী মুনিসিপল ব্যবস্থার প্রণয়ন হইয়াছিল। ঐ ব্যবস্থাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের কোন হাতই রাখা হয় নাই। কিন্তু পণ্য দ্রব্যাদির উপর মাসুল গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। (৩) কিন্তু এই ব্যবস্থাও বাঙ্গালার মধ্যে অকিঞ্চিৎকরপ্রায় হইয়াছিল।

কিন্তু সকল ব্যবস্থা কার্য্যকর হউক বা না হউক, ঐ সময়ে যে যে ব্যবস্থার প্রণয়ন অথবা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়াছিল তৎসমুদয়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে শাসনপ্রণালী যে উচ্চতর সোপান অবলম্বন করিতেছে এরূপ অনেক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকদ্দমায় আসামীরা উকীল নিযুক্ত করিতে পারিত না। এক্ষণে তাহারা

(১) ১৮৪২ অব্দের ১০ আইন।

(২) কাশীধামে এবং শ্রীরামপুরে ও বেরেলীতে।

(৩) ১৮৫০ অব্দের ২৬ আইন।

উকীল দিতে পারিবে এরূপ একটী ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইল। চোরদিগের প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদানের বিধি ছিল। ১৮৩৪ অব্দে বেণ্টিঙ্ক সাহেব ঐ ব্যবস্থা রহিত করেন। আবার ১৮৪৪ অব্দে উহা প্রবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে পুনর্ব্বার উঠাইয়া দেওয়া হইল। সুপ্রীম কোর্টের প্রভাবে কলিকাতার ছোট আদালত নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। একটী ব্যবস্থা করিয়া ছোট আদালতের অধিকার দৃঢ়তর করা হইল।

কিন্তু অপর যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল সর্ব্বাপেক্ষায় লেক্স লোসি (১) নামক আইনটীই এ সময়ের প্রধান আইন। উহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ নিবন্ধন পৈত্রিক বিষয়ের অধিকারে বঞ্চিত হইবে না। এই আইন প্রচলিত হওয়াতে সে সময়ে মহা হুল-স্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। (২) বাস্তবিক. বেণ্টিঙ্ক সাহেবের সময় (৩) হইতেই বাঙ্গালার মধ্যে ঐ আইনের অনুযায়ী কার্য্য হইয়া আসিতেছিল এবং তাহা হওয়াতে বিশেষ কোন গোলযোগ হয় নাই দেখিয়াই গবর্ণমেণ্ট ঐ আইন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত করিবার ইচ্ছা করেন। (৪) অনন্তর ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা প্রচলনে একপ্রকার সম্মত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উহার ভারার্পণ করিলে ঐ আইন প্রচারিত হয়। হিন্দু সমাজ ঐ আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন, কিন্তু কোন ফল লাভ করিতে পারেন নাই। হিন্দুদিগের নিতান্ত ভয় (৫) হইয়াছিল যে ঐ আইন চলিলেই আর হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষা থাকিবে না। বাস্তবিক সেরূপ ভয়ের কোন কারণই নাই। মুসলমানের অধিকারকালে লেক্স লোসির অপেক্ষাও কত কঠিনতর বিধি প্রচারিত হইয়াছিল। যে সনাতন ধর্ম্ম সেই সকল আঘাত অতিক্রম করিতে পারিয়াছে তাহার পক্ষে লেক্সলোসি বিশেষ ভয়ের

(১) ১৮৫০ অব্দের ২১ আইন।

(২) পুনরুজ্জীবিত সংগ্রহ।

(৩) ১৮৩২ অব্দের ৯ আইনের ৮ এবং ৯ ধারা।

(৪) ১৮৪৫ অব্দে।

(৫) রেকর্ডর পত্র।

বিষয় হইতে পারে না। তবে এটি ক্ষোভের বিষয় বটে যে, ব্লাক্ আক্ট‌গুলির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়া ইংরাজেরা কতকদূর (১) কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন, কিন্তু লেক্স লোসির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়া হিন্দুরা কিছুই করিতে পারিলেন না।

না পারিবার প্রকৃত হেতু এই যে, মফস্বল আদালতে ইংরাজ অপরাধীদিগের বিচার সম্পাদিত করাইতে হইলে অগ্রে সর্ব্ববাদিসম্মত বিশুদ্ধ ফৌজদারী আইন প্রস্তুত করা আবশ্যক। সুপ্রসিদ্ধ মেকলে সাহেব তাহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ আইন তখনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারিত হইয়া প্রচারিত হয় নাই। অতএব যতদিন তাহা না হয় ততদিন ইংরাজদিগকে মফস্বল আদালতের অধীন করা স্থগিত রাখা হইল। ঐরূপ করাতে গবর্ণমেণ্টের বাস্তবিক কোন পক্ষপাত প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু সেরূপ পক্ষপাত না থাকিলেও বিদেশীয় এবং ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজার পক্ষে প্রজারঞ্জন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। প্রজাগণ সহজেই ওরূপ রাজার গূঢ়াভিসন্ধির প্রতি শঙ্কা করিয়া থাকে, অতএব তিল প্রমাণ পক্ষপাতের চিহ্ন দেখিলেই তাহাকে একবারে তাল করিয়া তুলে (২)।

অন্য কথা কি, বসন্ত রোগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ সময়ে বাঙ্গালী টীকা এবং ইংরাজী টীকার মধ্যে কোন্ প্রণালী বিশেষ ফলোপদায়ক ইহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনে নিযুক্ত প্রধান প্রধান ডাক্তারেরা রিপোর্ট করেন যে, ১৮০২ অব্দে ডাক্তার ফ্রেনিং কর্ত্তৃক এতদ্দেশে গোবীজের দ্বারা টীকা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ কার্য্যের নিমিত্ত কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা খরচ মঞ্জুর করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বৎসরে ২০ হাজার টাকার অধিক খরচ হইতেছে না। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, গোবীজের দ্বারা টীকা দিবার প্রণালী উৎকৃষ্টতর, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের হিতার্থ ইংরাজী টীকা দিবার বিশিষ্ট ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হন।

(১) ১৮৫০ অব্দের ১৮ আইন মাত্র বলে।

(২) পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ল সাহেবের বিরুদ্ধে দরখাস্ত।

কিন্তু দেশীয় অনভিজ্ঞ লোকেরা তাহাতেও গবর্ণমেণ্টের প্রতি সন্দিহান হয়।

এই সময়ে বাঙ্গালার বাণিজ্যের অবস্থা মধ্যবিধ হইয়াছিল। ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতদিন ধরিয়া যে স্থানে স্থানে তুলার চাষ করিতেছিলেন তাহা একবারেই উঠাইয়া দিলেন। তুলার রপ্তানি কম হইয়া গিয়াছিল। দেশী কাপড়েরও রপ্তানি আর কিছুই ছিল না। তবে গনিক্লথের রপ্তানি বিলক্ষণ বাড়িয়াছিল। ১৮৩৪-৩৫ অব্দে উহা দুই কোটী টাকার ছিল। ৪৯-৫০ অব্দে উহার মূল্য ২৭ কোটি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাঙ্গালার রাজস্ব নিতান্ত মন্দ অবস্থাপন্ন হয় নাই। যদিও সমস্ত ভারতবর্ষের আয় ব্যয় হিসাব করিলে এই সময়ে প্রতি বৎসরে এক কোটী টাকার অধিক লোকসান হইতেছিল তথাপি সুদ্ধ বাঙ্গালার আয় ব্যয় অপেক্ষা অনেক অধিক হইতেছিল। বাঙ্গালার আয়, ৯ কোটী ৮০ লক্ষের অধিক, ব্যয় ৩ কোটী ৭৩ লক্ষোও কিঞ্চিৎ ন্যূন। অতএব বাঙ্গালায় ৬। কোটী টাকারও অধিক লাভ ছিল।

কিন্তু কেবল মাত্র বাঙ্গালায় লাভ থাকিলে কি হইবে? ঐ সময়ে মান্দ্রাজে লোকসান, সিন্ধু প্রদেশেও লোকসান, বিশেষতঃ শিখদিগের সহিত যুদ্ধে অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছিল, অতএব রাজ্যের আয় বৃদ্ধির দিকেই গবর্ণর জেনারেলের বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি হায়দ্রাবাদের নিজাম যে ৮০ লক্ষ টাকা ধারিতেন তাহার অবিলম্বে শোধ চাহিলেন এবং টাকা পরিশোধের বিলম্ব হইলে বেরার প্রদেশ অধিকার করিয়া লইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। অনন্তর বাজিরাও পেশওয়ার এই সময়ে মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে যে বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা পেন্সন দেওয়া হইত তাহাও বন্ধ করা হইল। বাজিরাও ১৮১৭-১৮ অব্দে সংগ্রামে পরাস্ত হন এবং সেই অবধি উক্ত পরিমাণ পেন্সন পাইয়া বিঠুর নগরে বাস করিতেন। পরে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার উদ্যোগ হইতে লাগিল। ঐ ব্যাপার ১৮৪১ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে স্থগিত প্রায় হইয়াছিল। ৪৭ অব্দে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টী, ৪৮ অব্দে ১৩টী এবং ৪৯ অব্দে ১২টী মাত্র মকদ্দমা

হয়। এক্ষণে আবার ঐ আগুন জ্বলিল, কিন্তু বাঙ্গালায় আর উহার দাহ্য পদার্থ অধিক ছিল না—বোম্বাই প্রদেশে ইনামী জমির উপর কমিশন বসিয়া তাহার ন্যায়ান্যায় বিচারে প্রবৃত্ত হইল। তদ্ভিন্ন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভূমির রাজস্ব বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় সাড়ে বার লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইল। আর পঞ্জাব অধিকার হওয়াতে যে সমস্ত মহামূল্য রত্নাদি হস্তগত হইয়াছিল, তাহা সৈনিকদিগকে 'লুঠ' বলিয়া দেওয়া হইল না—সমুদায় রাজকোষ সম্ভুক্ত করা হইল। এই সকল উপায়ে এবং স্থলবিশেষে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া ডালহৌসি সাহেব রাজ্যের অকুলান নষ্ট করিয়া ব্যয় অপেক্ষা আয় এক কোটী টাকা অধিক করিয়া তুলিলেন। সুতরাং শিখ যুদ্ধের আরম্ভ হইতে যে পাঁচ টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ খোলা ছিল, তাহা বন্ধ করা হইল। নিজ বাঙ্গালার রাজস্বও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এক কোটী টাকা বাড়ান হইয়াছিল, এবং ব্যয় পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার অপেক্ষা ১৩ লক্ষ টাকা ন্যূন করা হইয়াছিল।

এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই আবার রাজ্যের অন্তঃশাসন সুনির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে আফিম এবং নিমক বোর্ড ভাঙ্গিয়া রেবিনিউ বোর্ডের সহিত মিলাইয়া দেওয়া অতি প্রধান কার্য্য বলিতে হয়। কারণ যদিও আপীলের কাজ ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা বোর্ডের হস্তে থাকাই ভাল অতএব বোর্ড মাত্রই মন্দ পদার্থ নয়, কিন্তু বোর্ডের সংখ্যা অধিক থাকিলে অনর্থ অপব্যয় হয়, সন্দেহ নাই।

ডালহৌসি বাহাদুর কয়েকটী কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(১ম) পুলিস কমিশন (২য়) ডাক কমিশন (৩য়) পবলিকওয়ার্ক কমিশন (৪) কমিসরিয়েট কমিশন এবং (৫) ষ্টড্ কমিশন।

পুলিস কমিশন অনুসন্ধান করিয়া যাহা যাহা স্থির করেন, সে সমুদায় অবগত হইয়া ডালহৌসি সাহেব কলিকাতার তাৎকালিক কয়েকজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত করিয়া নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। ঐ নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের মধ্যে একজন এদেশীয় লোকও নিযুক্ত হইয়া

ছিলেন। আর কলিকাতার পুলিসে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় সবলকায় দৌবারিক সমস্ত পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর বেতনে নিযুক্ত হয়। ফলকথা, এক্ষণে পুলিসের যে প্রকৃতি দেখা যাইতেছে, তাহার প্রথম সূত্রপাত রাজধানীতে ডালহৌসির সময়েই হইয়াছিল। মফস্বলের পুলিস তখন সংশোধিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং গ্রামিক চৌকীদারদিগের নিয়োগের এবং তাহাদিগকে মাহিয়ানা দিবার সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশে একটি আইনের পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। বাস্তবিক গ্রামিক চৌকীদারদিগের সম্বন্ধে আইন করিয়া জমীদারদিগের প্রতি তাহাদিগের মাহিয়ানা দিবার ভার অর্পণ করার গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার ছিল না। ১৭৯৩ অব্দের আইনে এই মাত্র লিখিত ছিল যে, গ্রামে গ্রামে যে সকল চৌকিদার থাকিবে, তাহাদিগের এক একখানি ফর্দ্দ জমীদারেরা গবর্ণমেণ্টকে দিবেন। ঐ চৌকীদারদিগকে কে নিযুক্ত করিবে, কে কি হিসাবে তাহাদিগকে মাহিয়ানা দিবে, তাহার কোন কথাই আইনে নাই। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে ঐ সমুদায় কার্য্যের ভার জমীদারদিগের উপর নিক্ষেপ করিতে চাহিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণে অসম্মত হইয়া দরখাস্ত করিতে লাগিলেন। আইন প্রচলিত হইল না, এবং দেশের মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার গ্রাম্য চৌকিদার থাকিতেও চুরি ডাকাইতির নিবারণ হইতে পারিল না।

বার্ত্তাবহ বিভাগে যে কমিশন বসিয়াছিল তদ্দারা অনুসন্ধান হইয়া স্থির হইল যে, ৩৬।৩৭ অব্দে বার্ত্তাবহ বিভাগে মোট আয় ১৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, ৪৬।৪৭ অব্দে ১৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা হইয়াছিল এবং ঐ অনুক্রমে বৎসরে বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। কমিশন ইহাও স্থির করিলেন যে, সাধারণ প্রজাবর্গের যত চিঠী যায়, সরকারী পত্র বিনা মাশুলে সে সমস্তের অর্দ্ধেক গিয়া থাকে এবং গড়ে প্রতি চিঠী লইয়া যাওয়ায় এক আনার তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র গবর্ণমেণ্টের খরচা পড়ে। অতএব একেবারে সর্ব্বত্র সমান মাসুল করায় যদিও বৎসর কয়েক পরে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সম্প্রতি অন্যূন নয় লক্ষ

টাকা বার্ষিক ক্ষতি হইবে। ডালহৌসি সাহেব ঐ ক্ষতির ভয়ে ভীত হইলেন না। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের মত লইয়া সর্ব্বত্র ডাকের মাশুল সমান করিয়া দিলেন। কিন্তু সংবাদ পত্রাদির মাশুল পূর্ব্বে যেমন ছিল সেইরূপই রহিল। আর বিশেষ রেজিষ্টরী ভিন্ন চিঠীর রসিদ দিবার যে বহি ছিল তাহাও উঠিয়া গেল। বেয়ারিং পত্রের দ্বিগুণ মাশুল লাগিবে ইহাও অবধারিত হইল। পবলিক ওয়ার্কস্ সম্বন্ধে যে কমিশন নিযুক্ত হয় তদ্দ্বারা বিশেষ কোন কাজ ঐ সময়ে হয় নাই। তবে পবলিক ওয়ার্কস্—মিলিটারী বোর্ডের হস্তে থাকায় কাজ ভাল হয় না এবং সেই জন্য ওটীকে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ করা আবশ্যক, এই মত স্থির হয়। ঐ সময়েই ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ইউরোপীয় সৈনিকদিগের নিমিত্ত নূতন নূতন বারিক প্রস্তুত করা আবশ্যক, এরূপ একটি মত দাঁড়াইয়া যায়।

কমিসেরিয়েট্ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইয়া অনেক চুরি এবং অত্যাচার ধরা পড়ে এবং উচ্চপদস্থ অনেক বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারীরও নিতান্ত অনবধানতা প্রকাশ পায় (১)। কিন্তু ঐ সকল অনুসন্ধান হইয়া কোন বিশেষ ফল দর্শিয়াছিল বোধ হয় না। তবে পূর্ব্বাপেক্ষায় কিছু সাবধানতা বাড়িয়াছে বলিতে হইবে; আর কমিসেরিয়েটের কাজ পূর্ব্বে যত খাসে রাখা হইত এক্ষণে আর তাহা না হইয়া অধিকাংশই প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিয়া কণ্ট্রাক্ট লইয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়। ষ্টড্ কমিশনের অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, কোম্পানির আড়গড়া রাখিয়া আর বিশেষ লাভ নাই। এদেশে যে ঘোড়া প্রস্তুত হয় তাহা ইউরোপীয় অশ্বারোহী সৈনিকবর্গের নিতান্ত অনুপযোগী। তদ্ভিন্ন ঐ সকল ঘোড়ার ঘাস, দানা, ওট্ প্রভৃতি এদেশে প্রস্তুত করিয়া লইতে যে খরচ পড়ে ইংলণ্ড হইতে তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে আনাইতে পারা যায়। এস্থানে একথাও বলা আবশ্যক যে, ঘাস দানার কণ্ট্রাক্ট প্রধান প্রধান সৈনিক সাহেবেরাই পাইতেন। কিন্তু এই সমস্ত অনুসন্ধান হইয়া বিশেষ কোন ফল দর্শে নাই। অষ্ট্রেলিয়া

(১) লালা জ্যোতিঃপ্রসাদের মোকদ্দমা।

হইতে ওয়েলার ঘোড়া আসিতে আরম্ভ হওয়ায় এখানকার আড়গড়া সমস্ত ক্রমে ক্রমে আপনা হইতেই পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়া যাইতেছে।

এই সকল কমিসান ভিন্ন ডালহৌসি সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ওস্যাগ্‌নেসী সাহেবের দ্বারায় কলিকাতা হইতে খাজরী পর্য্যন্ত একটী তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রস্তুত করান এবং ঐ কার্য্য অতি সত্বরে এবং নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিলে উল্লিখিত ডাক্তার সাহেবকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়া তাঁহার দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া তাড়িতের তার বসাইবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করেন। ডিরেক্টরেরা ওস্যাগনেসী সাহেবের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া অনুমতি প্রদান করেন।

বাস্তবিক ঐরূপ সময়ে ঐরূপ বিষয়ে অনভিমতি হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ৪৭।৪৮ অব্দে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবিপ্লব নিবন্ধন বাণিজ্যের যে ব্যাঘাত হইয়াছিল এক্ষণে আর তাহা ছিল না। সর্ব্বত্র ইংলণ্ডীয় রাজ্যশাসন প্রণালী অনুকৃত হওয়ায় রাজা প্রজার পরস্পর বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন জাতীয়েরা এক প্রকার রাজনীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইবার জন্য অভিলাষ করিতেছিল। ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে স্থির সৌহৃদ্য জন্মিয়া গিয়াছিল। কালিস হইতে ডোবর পর্য্যন্ত তাড়িৎ তার সমুদ্র গর্ভ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। মিসরের অভ্যন্তর দিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হইতেছিল। মহারাজ্ঞীর পতি মহাত্মা প্রিন্স আলবর্ট এবং ফ্রান্সের অধীশ্বর তৃতীয় নেপোলিয়ন, এই দুই মহাপুরুষের ধর্ম্মে সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিতা ছিলেন। প্রিন্স আলবর্টের যত্নে পৃথিবীর সর্ব্ব দেশ হইতে যাবৎ কৃষ্যুৎপন্ন এবং শিল্পজাত ইংলণ্ডে নীত হইয়া মণি-ভবনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এক বঙ্গদেশ হইতেই ২৭শত প্রকার কৃষিজাত দ্রব্য যায়। তাহার মধ্যে চাউল ৫০ প্রকার, তৈলবীজ ১৬ প্রকার, গন্ধ দ্রব্য ৬৮ প্রকার এবং গালা ১৬ প্রকার; তদ্ভিন্ন এতদ্দেশপ্রসিদ্ধ শিল্পজাত সমুদায়।

যাহা হউক, এমত সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাড়িত তার বসাইবার প্রস্তাব কোন ক্রমেই অগ্রাহ্য হইতে পারে না, অতএব সহজেই সেই কার্য্য আরম্ভ হইল। এদিকে বাণিজ্যের সুশৃঙ্খলা হওয়াতে টাকার বাজার আবার সস্তা হইয়াছিল। সুতরাং ডিরেক্টরেরা যে ৫ টাকা সুদ মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাহাই যথেষ্ট বোধ হওয়াতে ইণ্ডিয়া রেইলওয়ে কোম্পানির উৎপত্তি সহজেই হইতে পারিল—ঐ যৌথ কারবারে টাকা পাইতে কোন অসুবিধা হইল না। কোম্পানির সেয়ার প্রধানতঃ ইংলণ্ডে এবং কিছু কিছু এদেশেও বিক্রীত হইতে লাগিল। ফল কথা, বাঙ্গালার ঐ রেলওয়ের কার্য্যারম্ভ হইবার উপক্রম হইল—বোম্বাইয়ের দিকে আরম্ভ হইয়া গেল।

এই সময়ে বাঙ্গালার বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহা বলা যাইতেছে। ইংলণ্ড হইতে সূতা এবং কাপড় ২ কোটি ৮৫ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার আমদানি হয়, ধাতু বিনির্ম্মিত দ্রব্য ৫০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার আইসে এবং মদ্যও ১১ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার আমদানি হয়। লবণের আমদানি পূর্ব্বে ২৬৩০ মণ মাত্র হইয়াছিল; এক্ষণে উহা ১০ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত মণ হইয়া দাঁড়ায়। রপ্তানি রেসমের দর বাড়ে নাই—চিনির কিছু কমিয়াছিল, তুলা পূর্ব্ববর্ষে ২২ হাজার ৫ শত মণ হইয়া পড়িয়াছিল! উহা এক্ষণে ২ লক্ষ ৮১ হাজার মণ হইয়া উঠে। এরণ্ড তৈলের রপ্তানি বাড়িয়াছিল। গনি ক্লথ ১৬ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ টাকার হইয়া গিয়াছিল। পাট ৯ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকার হইয়াছিল। মঞ্জিষ্ঠা ৬ লক্ষ ২০ হাজার হইতে ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার হইয়া উঠিয়াছিল।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে ইহাই বোধ হয় যে (প্রথমতঃ) বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান শিল্পজাত যে কার্পাস বস্ত্র তাহার রপ্তানি বন্ধ হইয়া গিয়া এখানে বিলাতি কাপড়ের আমদানি বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে দেশের মঙ্গল মনে করিলে অমঙ্গলই সূচিত হয়। অমঙ্গল এই যে, এখানকার একটী শিল্পজীবী জাতি—সমাজের একটী অঙ্গ—অবসন্ন

হইল। মঙ্গল মনে করা যায় এই যে, সস্তা দরে কাপড় পাওয়ায় পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক লোকে ভাল কাপড় পরিতে পাইল। (দ্বিতীয়তঃ) ইহাও বোধ হয় যে, বাঙ্গালার কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য সকল সময়ে সমান ভাবে চলে না। এক বৎসর পাট বাড়িল, আবার তাহা কমিয়া গিয়া মসিনা বৃদ্ধি পাইল। এই চিনি কমিল, আবার এরণ্ড তৈলই হউক আর যাহাই হউক অপর একটা কিছু বাড়িয়া উঠিল। ইহাতেও মঙ্গলামঙ্গল উভয় লক্ষণই আছে। মঙ্গল এই যে, দেশের উর্ব্বরতা গুণেই হউক আর লোকের শ্রমশীলতা নিবন্ধনই হউক বাঙ্গালার কৃষ্যুৎপন্ন সামগ্রী একটা না একটা পৃথিবীর অপরাপর লোকের প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। অমঙ্গল এই যে, পৃথিবীর অপরাপর জাতীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলে বাঙ্গালার বাণিজ্য অমনি হারি মানে। সুতরাং বাঙ্গালার মধ্যে কোন বিশেষ দ্রব্যের কৃষি বা বাণিজ্য করিয়া অধিক লোক অধিক কাল ধরিয়া সম্পত্তিশালী থাকিতে পারে না।

এদেশীয় লোকের ত কথাই নাই; যে ইউরোপীয় বণিক্ বা শ্রীবৃদ্ধিকারিগণ এখানে কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগেরও ঐ দশা ঘটে। আসামে চায়ের চাস্ করিয়া ঐ সময়ে কয়জন ইংরেজ বড় মানুষ হইতে পারিলেন? অথচ আসামে চা' দিন দিন উৎপন্ন অধিক হইতেছিল এবং দরও বাড়িতেছিল। যাঁহারা চাক্ষেত্রের অধিকারী ইংরেজদিগকে টাকা ধার দিয়া সুদ লইতেন তাঁহাদেরই বিশেষ লভ্য হইত। ক্ষেত্রস্বামীরা প্রায়ই দেউলিয়া হইয়া যাইতেন। ফলকথা, এদেশের বাণিজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশের লোকের হাতে নাই, ইউরোপীয়েরা এখানকার বাণিজ্য করেন। ইউরোপীয়েরা সর্ব্বদাই সমস্ত পৃথিবীর সংবাদ লইতেছেন, নিরন্তর এই উপায় দেখিতেছেন—কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র অধিক স্বদেশে অর্থসংগ্রহ করিয়া চলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ হওয়াতে এখানকার বাণিজ্য এবং বাণিজ্যের উপরে যে কৃষি বিশিষ্টরূপে নির্ভর করে সে কৃষি, স্থিরতর ভাবে চলিতে পায় না। একটী দ্রব্যে এক বৎসর যেমন লাভ হইল, অমনি সবেগে তাহার চাষ চলিতে লাগিল, পর বৎসর আর তেমন লাভ

হইল না, অমনি তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আর একটা ধরা হইল। এই প্রকার অস্থিরচিত্ততায় এখানকার বাণিজ্য ব্যবসায়ের সমূহ অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৫২ অব্দেই একটী এমত ব্যাপার ঘটে যাহাতে বাঙ্গালা দেশের তদুপলক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার একখানি বিশেষ মানচিত্র দেখিয়াই ভূতত্ত্ব বিদ্যা বিশারদ মর্কিসন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ঐ ভূভাগে অনেক স্বর্ণ খনি পাওয়া যাইবে। তাঁহার সেই কথা এতদিনে ফলিল। অষ্ট্রেলিয়ার নানা স্থানে যথেষ্ট সোণা পাওয়া যাইতে লাগিল। অমনি ইংলণ্ডের বণিক পোত সমস্ত দলে দলে ঐ দেশের অভিমুখে ধাবিত হইল। বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে যত জাহাজ আসিত আর তত আসিল না, এবং এদেশের বাণিজ্য যে পরিমাণে বাড়িয়া আসিতেছিল তাহা একবারে থামিয়া গেল অর্থাৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন প্রতি দ্বাদশ বর্ষে দ্বিগুণিত হইতেছিল আর সেরূপ হইল না।

কিন্তু বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি দেশের যে সমস্ত শুভলক্ষণ আছে তাহার অপেক্ষা এতদ্দেশের পক্ষে অধিকতর একটি শুভ ব্যাপার এই সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোম্পানির শেষ চার্টর ১৮৩৩ অব্দে পাওয়া হয়, সুতরাং আগামী ১৮৫৩ অব্দে ঐ চার্টর বদল হইবার সময়। এই জন্য ভারতবর্ষের শাসন কার্য্যের প্রতি ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্টর দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। ইহার সমস্ত ব্যাপার অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটী কমিটি বসিল। এদেশে অনেক দরখাস্ত পড়িতে আরম্ভ হইল, কোন কোন প্রধান রাজকর্ম্মচারী উল্লিখিত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা রাজকার্য্যের বিশেষজ্ঞ তাঁহারা কোম্পানির রাজত্ব কি ভাবে চলিতেছে, তাহার গুণ কি, ত্রুটিই বা কি আছে, কি করিলে ঐ ত্রুটির সংশোধন হয়, এইরূপ বিচার পরিপূর্ণ পুস্তক প্রণয়ন করিতে লাগিলেন এবং এতদ্দেশীয় কোন কোন প্রধান ব্যক্তি বিলাতে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত যাইবেন এমন জনরব শুনা যাইতে লাগিল। বিলাতে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইলেই

এখানকার কর্তৃপক্ষ বিশেষ সাবধানতা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২।৫৩ অব্দ ঐরূপ সাবধানতায় চলিল।

সিবিলিয়ান সাহেবেরা উত্তমরূপে শিক্ষিত হয়েন না, বিশেষতঃ প্রজাদিগের জাতীয় ভাষা ভাল রূপে শিক্ষা করেন না, এইরূপ প্রবাদ উঠিয়াছিল। অতএব ঐ দোষ সংশোধনের নিমিত্ত এক্ষণে নিয়ম হইল যে, সিবিলিয়ানেরা প্রথমে যে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন তাহার পর আবার নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে তাঁহাদিগকে দেশীয় ভাষায় আর দুইটী পরীক্ষা দিতে হইবে।

বাঙ্গালার আদালত হইতে ফারসী ভাষার ব্যবহার পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা গেলেও সাহেবেরা বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতেন না বলিয়া উকীল মোক্তারেরা উর্দ্দু ভাষাতেই সওয়াল জবাব করিতেন। কিন্তু এই সময় হইতে ঐ প্রথা রহিত করিবার জন্য প্রস্তাব হইল। বিচারপতিরা স্বহস্তে মোকদ্দমার সকারণ নিষ্পত্তি লিখিবেন এরূপও একটি নিয়ম হইল।

তদ্ভিন্ন সমস্ত ভারতবর্ষে তাড়িৎ বার্ত্তাবহ চালাইবার অনুমতি প্রদত্ত হইল। সকল থানাতেই এক একটি ডাকের আড্ডা হইল। চীন, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যাহাতে বাষ্পীয়পোত সমস্ত নিয়ত যাতায়াত করে তাহারও বন্দোবস্ত হইয়া উঠিল।

আর সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত খয়েরপুর নামক স্থান এবং ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত পেগু প্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকার সম্ভুক্ত হইল। কিন্তু ঐ সকল ব্যাপারের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কাছাড় প্রদেশ যে এই সময়ে বাঙ্গালা সম্ভুক্ত হয় তাহারই সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। কাছাড়ের রাজা তুলারাম সেনাপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র নকুলরাম এবং ব্রজনাথ ঐ প্রদেশের অধিকারী হন। এমন সময়ে নাগা জাতীয়েরা কাছাড় আক্রমণ করে এবং নকুলরাম তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া মারা পড়েন। ১৮৩৪ অব্দের সন্ধিপত্রে লিখিত ছিল যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কাছাড় রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে রাজা স্বয়ং দেশ রক্ষা করিতে যাওয়ায় সেই সন্ধিপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইল। অতএব গবর্ণমেণ্ট কাছাড় অধিকার করিয়া লইলেন।

পরন্তু ঐ সকল রাজ্য গ্রহণ করায় যে রাজ্যের আয় অল্প হয় নাই, প্রত্যুত বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য সিক্কা ৫৲ টাকা সুদের যে সকল প্রাচীন কাগজ ছিল তাহা পরিশোধ করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। এবং গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৩॥০ টাকার নূতন কাগজ খুলিলেন।

১৮৫৩ অব্দে চার্টার বদল হইয়া কোম্পানী পুনর্ব্বার সনন্দ পাইলেন। এবারে কোম্পানীর শাসনকার্য্য সম্বন্ধে যে যে পরিবর্ত্তন করা হইল তাহা সংক্ষেপে এই—(১) কোর্ট অব ডিরেক্টরের সভার সদস্যের সংখ্যা ২৪ ছিল। এক্ষণে ১৮ মাত্র হইল, আর ঐ ১৮ জনের মধ্যে ১২ জন প্রোপ্রাইটরদিগের মনোমত এবং ৬ জন রাজার মনোনীত লোক হইবেন, এই নিয়ম হইল। (২) সমস্ত ভারতবর্ষের নিমিত্ত একটী ব্যবস্থাপক সভা নিয়োজিত হইবে। সেই সভায় গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যসচিবগণ এবং মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আগ্রা এবং কলিকাতা এই চারি স্থানের প্রতিনিধিস্বরূপ চারিজন সিবিলিয়ান, আর সুপ্রীম কোর্টের দুইজন জজ এবং গবর্ণর জেনারেলের মনোনীত আর দুই জন সিবিলিয়ান এই কয়েক জন মাত্র সভ্য হইবেন স্থির হইল। (৩) পঞ্জাব প্রদেশ গবর্ণর জেনারলের অধীনে একটী স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন হইবে। (৪) বাঙ্গালা প্রদেশ একজন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন হইবে। (৫) সিবিল সার্ব্বিসে নিযুক্ত করিবার অধিকার কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের হস্ত বহির্ভূত হইয়া সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা সিবিল সার্ব্বিসের কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করা যাইবে।

ইংলণ্ডীয় মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার হইয়া এই হইল। ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা কি পাইলেন? ইঁহাদিগের কোন পূর্ব্বস্বত্ব বজায় অথবা কোন নূতন অধিকার প্রাপ্তি কিছুই হইল না। তবে ইঁহারা বিলাত গিয়া পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সিবিল

সার্বিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন—এই দ্বারটুকু উন্মুক্ত হইল বলা যাইতে পারে। প্রত্যুত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহাঁদিগের কোন লাভই হইল না। তবে সিবিলিয়ানদল এদেশের শাসনকর্ত্তা, অতএব যে উপায়ে তাঁহাদিগের সুশিক্ষা সাধন এবং বিবেকশীলতার পরিবর্দ্ধন হয় তাহা অবশ্যই এদেশীয়দিগের উপকারে আসিবে সন্দেহ নাই।

ঐ সময়ে পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যে সকল বক্তৃতা হয় এবং কমিটিতে যে সকল সাক্ষ্য গ্রহণ হয় তদ্দারা ইহাই প্রতীত হইয়া যায় যে, এদেশের লোকেরা প্রকৃত পক্ষে নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর উপযুক্ত নহে!—ইহারা সাহসিক, বলবান এবং বুদ্ধিমান হইয়াও নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত, অপরের অধিনায়কতা ভিন্ন স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কিছুই করিতে পারে না এবং ইহারা উচ্চ পদেরও অযোগ্য, কারণ নিরতিশয় ঈর্ষ্যাদ্বেষপূর্ণ এবং একান্ত স্বজাতি-বিদ্বেষ্টা।

কিন্তু উদারচেতা ইংরাজের আমাদিগকে আমাদিগের এই সকল দোষ দেখাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়েন নাই। সকল দোষ নিবারণে একমাত্র পরিশুদ্ধ উপায় যে সুশিক্ষাপ্রদান তাহারও জন্য বিশিষ্টরূপেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা শিক্ষা প্রণালীর মূল সূত্র সকল নির্ম্মিত করিয়া দিয়া এই সময়ে যে অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ে সাহায্যদান প্রণালী সেই অনুজ্ঞাপত্রের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে এবং এতদ্দেশীয়দিগকে স্বকার্য্য নির্ব্বাহে সক্ষম এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবিরহিত করিয়া তুলিতেছে। ঐ শিক্ষালাভের গুণেই বাঙ্গালীরা মাতৃভাষাকে তেজস্বিনী করিয়া তুলিলেন, অন্যদীয় সহায়তার অপেক্ষা রহিল না। ঐ শিক্ষালাভের গুণেই বাঙ্গালীদিগের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতা বৃদ্ধি পাইয়া দিন দিন স্বজাতি বিদ্বেষরূপ মহাপাপের মূলোচ্ছেদন করিতেছে। আর কিছু দিন গত হইলে বোধ হয় উল্লিখিত দোষগুলির একেবারেই অপনয়ন হইবে এবং আমরা নিয়মতন্ত্রতা ও উন্নতপদের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারিব। এইটী নিরন্তর স্মরণ করিয়াই এতদ্দেশীয় জনগণের চলা কর্ত্তব্য। চার্টর বদলের

সময়ে এখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অন্যান্য কথার মধ্যে এই বলিয়া আবেদন করিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপক সমাজে এতদ্দেশীয় লোক অধিক পরিমাণে গৃহীত হউক এবং যেমন ইংলণ্ডীয় হউস অব কমন্সের হস্তে রাজস্ব আদানের শক্তি নিহিত আছে ঐ ব্যবস্থাপক সভার হস্তেও সেইরূপ থাকুক। বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া উঠিলেই প্রকৃত প্রস্তাবে, নিয়মতন্ত্রতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ঐ পদার্থটি লাভ করা অল্প কথা নহে। উহা জাতি বিশেষের অনেক তপস্যার ফল। ইংরাজেরা ঐরূপ নিয়মতন্ত্রতা অনেক বিবাদ বিসংবাদের পরে ১৬৮৮ অব্দ হইতে পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছেন। জর্ম্মণ, ইটালীয়, ফরাসীরা উহা ১৮৪৮ অব্দ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদিগের এমন ভাগ্য কি, আমরা এমন তপস্যাই বা কি করিয়াছি যে, চাহিবামাত্র তাদৃশ মহানিধি একেবারেই হাতের উপরে পাইব। কিন্তু ঐ দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া পুরুষানুক্রমে যত্ন করিতে করিতে যে না পাওয়া যাইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। যে ক্ষুধা দেয় সেই আহার দেয়। ইংরাজ জাতির সংসর্গ এবং ইংরাজ জাতির স্থানে শিক্ষা গ্রহণ যে মহান্ অভিলাষ জন্মিয়া দিতেছে, তাহা তেমন প্রখর হইয়া উঠিলেই উদারচেতা ইংরাজ কর্তৃক আবার উপশান্তও হইবে! এক্ষণে প্রতি পুরুষে প্রতি ব্যক্তির ঐ দিকে দৃষ্টি রাখা এবং যে দুইটী জাতীয় দোষ ইংরাজেরা দেখাইয়া দিয়াছেন নিরন্তর যত্ন দ্বারা সেই দোষের সম্পূর্ণ অপনয়ন করাই এতদ্দেশীয়দিগের পরম ধর্ম্ম।

পার্লিয়ামেন্টের ব্যবস্থানুসারে ১৮৫৪ অব্দের মে মাসের প্রথম দিবসে হালিডে সাহেব বাঙ্গালার প্রথম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইলেন। কয়েক বৎসর হইতেই বিশিষ্ট চেষ্টা হইয়া আসিতে ছিল যে, বাঙ্গালায় একজন স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। বিশেষতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নিমিত্ত একজন স্বতন্ত্র লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া অবধি অনেকেরই বোধ হইয়া গিয়াছিল যে, বাঙ্গালার জন্যও একজন সেই প্রকার লোকের প্রয়োজন। বাস্তবিক বাঙ্গালা প্রদেশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপেক্ষাও অধিক বিস্তীর্ণ। ইহাতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অপেক্ষাও অধিক লোকের বাস। উত্তর

পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা পরস্পর যত ভিন্নপ্রকৃতিক, বাঙ্গালার লোকে তাহা অপেক্ষাও অধিক বিভিন্ন প্রকৃতিক। বাঙ্গালা প্রদেশের ভিন্ন ভি স্থানবাসী উড়িয়া, ছোটনাগপুরিয়া, বেহারী, আসামী এবং কাছাড়ী প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিদিগের আচার, ব্যবহার, ভাষা, প্রকৃত বাঙ্গালী-দিগের হইতে এবং পরস্পরে ভিন্ন। সুদ্ধ তাহাই নহে। রাজস্বদানের বন্দোবস্তও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এক প্রকার নয়। বাঙ্গালা এবং বেহারের মধ্যে যেরূপ চিরস্থায়ী জমীদারী বন্দোবস্ত, উড়িষ্যায় সেরূপ নহে। সেখানেও জমীদার আছে কিন্তু তাহাদিগের সহিত সাময়িক (১) বন্দোবস্ত প্রচলিত। ছোট নাগপুরে প্রকৃত প্রস্তাবে জমীদারী নাই। কিন্তু জমি-দারী রীতি ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে (২)। আসামে জমিদারী প্রণালীর কোন চিহ্নই নাই। ওখানে প্রজাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ বন্দোবস্ত হয়—অথচ প্রজারা একজন মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তির হস্তে রাজস্ব প্রদান করে। গবর্ণমেণ্ট ঐ রাজস্বের শতকরা হিসাবে কিঞ্চিৎ ঐ মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিকে তাহার ভৃতিস্বরূপ দেন।

এমন দেশের শাসন কর্ত্তৃত্বে কোন এক জন লোক সম্পূর্ণ রূপে যোগ্য হইতে পারেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহাতে এত দিন এদেশের একজন স্বতন্ত্র শাসন কর্ত্তাই ছিলেন না। গবর্ণর জেনারেল সমুদায় ভারতবর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অবকাশক্রমে বাঙ্গালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। অথবা যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে যখন তাঁহারও অবকাশ থাকিত না তখন তাঁহার কার্য্য সচিবগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ডেপুটী গবর্ণর করিয়া দিয়া যাইতেন। যাহা হউক বাঙ্গালা প্রদেশের প্রতি এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের তেমন মনোযোগ হইতে পায় নাই। এই সময় অবধি তাহা হইবার উপক্রম হইল।

প্রথমতঃ সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশের লোকসংখ্যা করিবার একটি প্রস্তাব উপস্থিত হইল। দ্বিতীয়তঃ প্রতি জিলায় রাস্তা, ঘাট এবং পবলিক ওয়ার্ক,

(১) মোগলবন্দি, গড়জাত, কিল্লা এই তিন প্রকার ভূমির তিন প্রকার বন্দোবস্ত।

(২) ভূইহারি, জমীদারী, খাস, এই তিন প্রকারের তিন প্রকার ব্যবস্থা।

ও পুলিসের খরচার নিমিত্ত এক একটী হিসাব প্রস্তুত হইবার কথা হইল। কলিকাতার প্রণালী সমস্ত যথাযথ রূপে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ঋণ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইল।

এই সকল প্রস্তাব ভিন্ন অপর কয়েকটী কার্য্যও নির্ব্বাহিত হইল। পবলিক ওয়ার্কের নিমিত্ত একজন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের যে সকল বিশেষ ক্ষমতা এবং সম্ভ্রম ছিল সে সকল লোপ করা হইল। বাঙ্গালার রাইয়তদিগের দুরবস্থার হেতু বিষয়ে অনুসন্ধান হইয়া বিজ্ঞাপনী গৃহীত হইল। হালিডে সাহেব মফস্বলের অনেকগুলি জেলা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলেন।

প্রজাদিগের মধ্যে কোন বিশেষ চেষ্টা এ সময়ে লক্ষিত হয় না। নীলকর সাহেবেরা অনেকে মিলিয়া কলিকাতায় একটি সভা সংস্থাপন করেন মাত্র। আর সদর দেওয়ানি আদালতের অনেক মোকদ্দমা বাকী পড়িয়া যায় বলিয়া ঐ আদালতের উকীলেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত করেন।

শিক্ষা বিভাগের কার্য্যে নূতন প্রকার বন্দোবস্ত হইয়া কৌন্সিল অব এডুকেশন সভা উঠিয়া যায় এবং ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়েরও কার্য্যারম্ভ হয়।

১৮৫৪ অব্দে বাঙ্গালার বাণিজ্য পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা বিশেষ ঔৎকর্ষ লাভ করে নাই। পূর্ব্ব বর্ষে আমদানি ৪কোটি ৮৬লক্ষ টাকার হইয়াছিল, এ বর্ষে ৫কোটি ৫৮লক্ষ টাকার হয়। কিন্তু রপ্তানি পূর্ব্ব বর্ষে ১১কোটি ১৮লক্ষ টাকার হইয়াছিল, এ বর্ষে ১০ কোটি ৬৭ লক্ষের বড় অধিক হয় নাই। এই সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব পরিমাণ অন্যূন ১০ কোটি—এ প্রদেশের ব্যয় প্রায় ৪কোটি—উদ্বৃত্ত প্রায় ৬কোটি টাকা। কিন্তু ঐ উদ্বৃত্ত টাকার অধিক ভাগই ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের ক্ষতি পূরণার্থ ব্যয়িত হইত। বাঙ্গালার উপকারার্থে ব্যয়িত হইতে পারিত না। এই জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রস্তাব করেন যে, নবদ্বীপ বিভাগের নদী সকলে যে মাশুল আদায় হয় তাহা ফেরি ফণ্ডের টাকার সহিত সংযুক্ত করিয়া

দিয়া ঐ তহবিল হইতে বাঙ্গালা দেশের রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করা হইবে। কিন্তু ঐ প্রস্তাবে বাস্তবিক কোন ফল দর্শিল না।

ও সময়ে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বন্দোবস্তের মধ্যে বিশেষ গোলযোগই উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ এই যে, পূর্ব্বের পাঁচ টাকা সুদের কোম্পানির কাগজগুলি পরিশোধ করিবার কথা উত্থাপন করিয়া ডাল্‌হৌসি সাহেব একপক্ষে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া ফেলিলেন এবং ৩॥০ টাকার কাগজ খুলিয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে যে টাকার যৎপরোনাস্তি সচ্ছলতা তাহাও দেখাইতে লাগিলেন অথচ পবলিক্ ওয়ার্কের নাম করিয়া ঐ সময়েই আবার ৫৲ টাকা সুদের অপর একটী কাগজ খুলিলেন। ইহাতে বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ জন্মিল। গবর্ণমেণ্টের উত্তমর্ণগণ ইহাতে ঠকিলেন বলিয়াই সকলের বোধ হইল। বিশেষ আন্দোলন করাতে ইহাও প্রকাশ পাইল যে, এই নূতন ৫ টাকার কাগজ খুলিবার বিষয়ে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতি গ্রহণ করা হয় নাই।

রাজধানীর মধ্যে উল্লিখিত ব্যাপার লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে, এমত সময়ে মফস্বলের মধ্যে একটি অতি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইল। দামন-ই-কো-প্রদেশবাসী সাঁওতালেরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া রাজকর্ম্মচারীদিগকে এবং নিরীহ প্রজাদিগকে চতুর্দ্দিকে বিনষ্ট করিতে লাগিল। বাঙ্গালার মধ্যে রাজবিদ্রোহের কোন শঙ্কা না থাকায় এখানে কখনই অধিক সৈনিক থাকে না। বিশেষতঃ পঞ্জাব রাজ্য জয় হইয়া অবধি বাঙ্গালা বিভাগের সৈন্যচয় অধিকাংশই সেই দেশে অবস্থিতি করিতেছিল। পেগুর অধিকারে মান্দ্রাজী সৈন্যই অধিক গিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার সৈন্যও কিছু গিয়াছিল। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ঝাঁসি প্রদেশের রাজা নিঃসন্তান পরলোকগত হওয়ায় ডালহৌসি সাহেব ঐ রাজ্যও অধিকার করিয়াছিলেন। সেখানেও কতক বাঙ্গালার সৈন্য গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন, অযোধ্যা প্রদেশে মুসলমান এবং হিন্দুদিগের মধ্যে হনুমানগড়ি নামক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের অধিকার লইয়া তুমুল বিবাদ

চলিতেছিল। এমন কি উভয় দলে কামান বন্দুক লইয়া দুই একটি সম্মুখ যুদ্ধও ঘটিয়া গিয়াছিল। তজ্জন্যও বাঙ্গালা হইতে কতক সৈন্য ঐ প্রদেশের চতুর্দ্দিকে সমবেত করা হইয়াছিল। ফলকথা, বাঙ্গালার মধ্যে তখন সৈন্য ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং সাঁওতালেরা নির্ব্বিঘ্নে দামন-ই-কো হইতে দলবলে বহির্গত হইল এবং দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া গ্রামাদি লুণ্ঠিত এবং নিরীহ প্রজাবর্গের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। তাহারা রাজ-মহল এবং রামপুরহাট অবরোধ করে, পাকুড় লুণ্ঠন করে, জঙ্গীপুর এবং রাণীগঞ্জ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করে—এবং রামপুর ও সিউড়ী সশঙ্ক করিয়া তুলে। সাঁওতালদিগের অস্ত্র—তীর ধনুক টাঙ্গী এবং লাঠি—তাহাদিগের বন্দুক কামান কিছুই ছিল না। তথাপি তাহাদিগকে নিবারণ করিবার কোন সুবিধাই সত্বরে ঘটিয়া উঠিল না। মহেশপুরে এবং জঙ্গীপুরের নিকট তাহারা সিপাহীদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিল—বীরভূমির মধ্যে ময়ূরাক্ষীর তীরে একজন সসৈন্য ইউরোপীয় সেনানীর প্রাণবধ করিল—এবং ইংরাজের রাজত্ব গিয়াছে বলিয়া কোথাও কোথাও আপনারা রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করিল।

সাঁওতালদিগের এরূপ পরাক্রমের মূল কারণ বাঙ্গালার সাংগ্রামিক সৈন্যের অভাব। কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি হেতু ছিল। উহারা বাস্তবিকই অন্যায়রূপে পীড়িত হইয়াছিল। ১৮৩৮ অব্দের পূর্ব্বে দামন-ই-কো প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ তিন সহস্র মাত্র সাঁওতাল বাস করিত। একজন ইংরাজ ঐ প্রদেশের ডেপুটী কালেক্টরের কর্ম্ম পাইয়া বিশিষ্ট অধ্যবসায় সহকারে স্বকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং সন্নিহিত পর্ব্বত এবং বনভূমি হইতে সাঁওতালদিগকে আনাইয়া বাস করান। ৫৫ অব্দে সাঁওতাল অধিবাসীর সংখ্যা ৮০ হাজারের অধিক এবং তাহাদিগের গ্রাম প্রায় ১৫ শত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রাজস্বেরও যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। তাহাতে সাঁওতালেরাও বাঙ্গালী রাইয়তদিগের অবস্থাপন্ন হইয়া মহাজনদিগের স্থানে ঋণ গ্রহণ করিতে

বাধ্য হইয়াছিল। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী মহাজনেরা অতিরিক্ত সুদ লইয়া তাহাদিগকে কর্জ্জ দিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋণজালে জড়িত হইলে এবং আদালতের ডিক্রী দ্বারা তাহাদিগের ভূমি সম্পত্তি বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইলে, সাঁওতালেরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া পড়ে।

তাহারা প্রথমে মনে করিয়াছিল দেশ ছাড়িয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বত এবং জঙ্গলে পলাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা চলিয়া আসিলে পর তাহাদিগের ত্যক্ত পর্ব্বত এবং বনময় দেশে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐরূপ প্রায়ই হইয়া থাকে। যে দেশ হইতে কতক লোক উঠিয়া যায় সে দেশে সত্বরেই আবার লোকের সংখ্যা বাড়িয়া তাহাদিগের স্থান পূরণ করে। অতএব পাহাড় জঙ্গলে পূর্ব্বাপেক্ষায় লোক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং সেদিকে আর ফিরিয়া যাইবে কি, বরং ঐ সকল স্থান হইতে তাহাদিগেরই অভিমুখে নূতন নূতন লোক আসিতেছিল। তাহাদিগের সহিত দামনই-কো নিবাসী সাঁওতালদিগের সংযোগ হইল এবং সকলে মিলিয়া চতুর্দ্দিকবর্ত্তী দেশ অধিকারের চেষ্টা করিল। একটি ধর্ম্ম ব্যাপারও তাহাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, একটি শিশুর প্রতি দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই শিশুর মুখ দ্বারা দেবতা তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে, তাহারা ইংরাজদিগের অস্ত্রে অভেদ্য শরীর হইবে এবং সমুদয় ইংরাজের অধিকার গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপে ধর্ম্মবল লোকবল একান্ত প্রপীড়ন এবং প্রতিযোগী সৈন্যের অভাব প্রভৃতি অনেক-গুলি কারণ মিলিত হইয়া সাঁওতালদিগকে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করে।

কিন্তু অচিরাৎ ইংরাজ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আগ্নেয়াস্ত্রের সমক্ষে তীর ধনুক কিছুই করিতে পারিল না এবং সাঁওতালদিগের অধি-নায়ক সিধুমাজি এবং কানুমাজি ধরা পড়িল। অনেক লোক বিনষ্ট, অনেকে কারাগৃহে নীত হইল। বিদ্রোহ দমনোপযোগী মার্সিয়াল ল প্রচারিত হইল এবং যেরূপে বনপশুর শিকার হয় প্রথম হাঙ্গামায় সেই রূপে বিদ্রোহী সাঁওতাল শিকার হইয়া গেল। ক্রমে সাঁওতালদিগের

বিচারার্থে একটি কমিশন নিযুক্ত হইল এবং সাঁওতাল পরগণা রেগুলেসন আইনের বহির্ভূত হইয়া থাকিল।

সাঁওতালদিগের ধর্ম্ম বিপ্লবের কথা বলা হইয়াছে। চমৎকারের বিষয় এই, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়াই এই সময়ে একটি ধর্ম্মান্দোলনের স্রোতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লক্ষণে বোধ হয় যে মুসলমানেরা যেন পুনরুত্থিত হইয়া উঠিতেছেন এবং কাফের বিনাশ করা যে তাহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা স্মরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাজারে বাজারে এমত অনেক উর্দ্দু ভাষার পুস্তক বিক্রীত হইয়াছিল যাহার তাৎপর্য্য হিন্দু এবং ইংরাজ উভয় জাতিরই অত্যন্ত প্রতিকূল। লর্ড অক্‌লণ্ডের সময়ে যখন রুসীয়দিগের আক্রমণের ভয় হয় তখনও একবার ঐরূপ হইয়াছিল। ফলতঃ এক্ষণেও ইংরাজদিগের সহিত রুসিয়ার বিবাদ চলিতেছিল। ঐ বিবাদের হেতুও ধর্ম্ম বিষয়ক বিরোধ বলিলে মিথ্যা হয় না। রুসিয়াধিপতি বলেন যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহার সম ধর্ম্মায়ত্ত খৃষ্টান বাস করেন। তিনি তাঁহাদিগের ন্যায় কর্ত্তা হইবেন। তুরস্কের সম্রাট তাহাদিগের প্রতি অযথাচরণ করিলে তিনি তাহার প্রতিবিধান করিবেন। তুর্কীয়েরা এ কথায় সম্মত হয় নাই। সুতরাং রুসিয়ার সহিত তুরস্কের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া যায় এবং ফ্রান্স মহীপতি তৃতীয় নেপোলিয়ন ইংরাজদিগের সহিত একযোগ হইয়া তুরস্কের রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করেন। এই জন্যই ক্রিমিয়া দেশে অতি তুমুল যুদ্ধ হইয়া পরিশেষে রুসিয়া পরাজিত হয়।

ইংলণ্ডের অভ্যন্তরেও ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মবিষয় লইয়া অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম বিষয় কেবল মাত্র যুক্তিমূলক হইয়া পড়িলে লোকের মত বিভিন্নতার পরিসীমা থাকে না। এই প্রকৃত তথ্যটি অনেকের হৃদয়গত হওয়াতে তাঁহারা মনে করিতেছিলেন যে, ধর্ম্মব্যাপারে একজন গুরু স্বীকার না করিলে চলে না, ঐকমত্য জন্মে না এবং সমাজের রক্ষাও হয় না। এইরূপ ভাবিয়া কতক ভাল ভাল লোক রোমান কাথলিক মত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যেমন তাঁহাদিগের মতি ঐ

দিকে বলবতী হইয়াছিল তেমনি পক্ষান্তরে যাঁহারা প্রটেষ্টাণ্টমতে বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন তাঁহাদিগের আবার বিদ্বেষবুদ্ধি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও পরধর্ম্ম সংস্রব অতীব দোষাবহ বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডীয় মতবাদের ঢেউ আসিয়া বাঙ্গালায় লাগিল।

কোম্পানী বাহাদুর এদেশীয়দিগের ধর্ম্মের সহিত সংস্রব রাখেন একথার পাছে অধিক আন্দোলন হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া এখানকার কর্তৃপক্ষীয়েরা দেবালয় সমস্তের সহিত সংস্রবশূন্য হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন।

বাঙ্গালার অন্তর্গত পুরুষোত্তম মহাক্ষেত্রের সহিত বহু কালাবধি গবর্ণমেণ্টের সংস্রব ছিল। গবর্ণমেণ্ট যাত্রীদিগের স্থানে কর লইতেন এবং জগন্নাথ দেবের যে ভূমি সম্পত্তি ছিল তাহারও আদায় উসুল করিতেন। এইরূপে যে অর্থ লাভ হইত তাহার কিয়দংশ রাজকোষ হইতে জগন্নাথ দেবের সেবার নিমিত্ত দেওয়া হইত। গবর্ণমেণ্ট যখন ওয়েলেসলীর সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্থানে উড়িষ্যা গ্রহণ করেন সেই অবধি সন্ধিপত্রে লিখিত হইয়া এরূপ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। অনন্তর গবর্ণমেণ্ট দেবসেবার ভার ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন--প্রথমে যাত্রীদিগের কর গ্রহণ উঠিয়া যায়—পরে বাজেয়াপ্তি কতক ভূমিও ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এক্ষণে খুর্দার রাজার প্রতি এককালে দেবসেবার ভার অর্পণ করা হইল।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে গবর্ণর জেনেরেলেরা এবং অপরাপর প্রধান রাজকর্ম্মচারীরা দেশীয় প্রধান প্রধান দেবালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে দেবালয়ে কিছু কিছু দান করিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিতেন। সিংহল দ্বীপ হইতে অদ্যাপি ঐ প্রথা উঠিয়া যায় নাই। কিন্তু ডালহৌসির সময় হইতে ঐ প্রথা একেবারেই ভারতবর্ষ হইতে উঠিয়া গেল। ইংরাজেরা যে অন্য কোন ধর্ম্ম প্রণালীর প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা করেন না, প্রত্যুত তৎপ্রতি অবজ্ঞা করেন ইহাই বিশেষ করিয়া প্রজাগণকে প্রদর্শন করা হইতে লাগিল। ছোট ছোট অনেক ইউরোপীয় রাজকর্ম্মচারী ঐ দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। অন্যের কথা কি, সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যেও কেহ কেহ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক পুস্তিকা সমস্ত সিপাহীদিগের হস্তে দিয়া

াদিগকে তৎপাঠে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ াহীদিগকে সমবেত করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম ভজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাঙ্গালার মধ্যেও ঐ সময়ে ধর্ম্ম বিচারের স্রোতঃ চলিয়াছিল। কলি- গার রাস্তায় রাস্তায় পাদ্রিরা যেমন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন—অমনি াদিগের পার্শ্বে পার্শ্বে নব্য ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের মত ব্যাখ্যা করিতে গলেন এবং কোন কোন স্থানে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের স্বপক্ষেও দুই টি বক্তৃতা হইতে লাগিল। নব্যেরা এই সময়ে আর একটি উপায় য়াছিলেন। এত দিন খৃষ্ট ধর্ম্মই এদেশের ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিয়া ার দোষ সমস্ত প্রদর্শন করিতেছিল—এই অবধি নব্যেরা খৃষ্ট ধর্ম্মের ত আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যে সকল সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ণুত খৃষ্ট ধর্ম্ম মানিতেন না, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ক্ত সকল সংগ্রহ করিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি লেরা ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান হইবে,—এ আশঙ্কা ন্যূন হইয়াছে।

প্রায়ই দেখা যায়, ধর্ম্ম বিষয়ে জনগণের মন বিশিষ্টরূপে আন্দোলিত ইলে সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা হিত্যের প্রথম সৃষ্টি বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইতে আরম্ভ হয়। অনন্তর াত্রিক প্রণালীতেও সাহিত্যের উন্নতির স্রোতঃ প্রবেশ করে। অনন্তর াজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়া বাঙ্গালা াষার সাময়িক পত্র এবং পুস্তিকাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ১৮৫৩ অব্দে মুদায় বাঙ্গালা গ্রন্থের সংখ্যা প্রাচীন নব্য ছোট বড় সমুদায় মিলাইলে ন্যূন চৌদ্দশত হইয়াছিল।

এই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে এবং সই যুদ্ধের সমকালে শিক্ষা প্রণালীর নূতন বন্দোবস্ত হওয়াতে বাঙ্গালা াহিত্যের আবার বিশেষ উন্নতি হইল। বিশেষতঃ অল্পকাল মধ্যেই আর একটি সমাজ-সংস্কার কার্য্যও উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতেও দেশীয় নগণের মন আন্দোলিত হওয়ায় সাহিত্য সংসার উৎকর্ষ লাভ করে।

পঞ্চম অধ্যায়।

লর্ড ক্যানিং—(হালিডে)।

লর্ড ডালহৌসি বাহাদুর ১৮৫৬ অব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান। তিনি যে আট বৎসর কাল এদেশে রাজত্ব করেন তাহার মধ্যে সাম্রাজ্যের বিস্তার পূর্ব্বাপেক্ষায় পঞ্চমাংশ এবং প্রজার সংখ্যা চতুর্থাংশ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু রাজ্যের আয় সে পরিমাণে বাড়ে নাই। প্রত্যুত বার্ষিক আয় অপেক্ষা ব্যয় দুই কোটী টাকা অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। তখন আয় ২১ কোটী—ব্যয় ২৩ কোটী। রাজ্যের ঋণও পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৩৪ অব্দে উহা ২৭॥০ কোটী ছিল, ১৮৪৭ অব্দে ৩৬॥০ কোটীতে উঠিয়াছিল, ১৮৫৬ অব্দে ৬২ কোটী হইল। কিন্তু যদিও সমস্ত ভারত সাম্রাজ্যের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইয়াছিল বটে এবং ঋণও বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তথাপি নিজ বাঙ্গালায় সে দুর্ঘটনা ঘটে নাই। বাঙ্গালার আয় বাঙ্গালার ব্যয় অপেক্ষা যেমন চিরকালই অধিক হইয়া আসিতেছিল, ও সময়ে তাহার অন্যথা হয় নাই। বাঙ্গালার আয় ৯ কোটীর অধিক, ব্যয় ৪ কোটীর ন্যূন ছিল।

রাজ্যের বিস্তার বৃদ্ধির সহিত আয়ের তাদৃশ বৃদ্ধি না হওয়াতে আর একটি দোষ জন্মিয়া গিয়াছিল। সিবিলিয়ান কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে গেলেই খরচ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। অতএব তাহা করা হয় নাই। সিবিলিয়ানেরা যে কাজ করিতেন তাহাতে সৈনিক পুরুষদিগকে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পঞ্জাব, পেগু, সিন্ধু, আসাম প্রভৃতি যাবতীয় নিয়ম বহির্ভূত প্রদেশের শাসন কার্য্য সৈনিক পুরুষদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছিল। তাঁহারা প্রজার পালন যেরূপেই করুন কিন্তু তাঁহারা নিজ সৈনিক কার্য্য ছাড়িয়া যাওয়াতে ঐ কার্য্য অল্পবয়স্ক সেনানীগণের হস্তে পড়িয়াছিল এবং তাহা সুনির্ব্বাহিত হইতেছিল বলিয়া বোধ হয় না।

তদ্ভিন্ন রাজ্যের বিস্তার অধিক হওয়াতে সেই বিস্তৃত রাজ্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত সৈনিকদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল, এবং ডালহৌসি সাহেব যদিও রেগুলার সৈনিকদলের বিশেষ বৃদ্ধি করেন নাই, তথাপি তাঁহাকে ইরেগুলার সৈনিকের সংখ্যা ৩০ সহস্রের অধিক বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। ইরেগুলার সৈনিকদলের ব্যবস্থা এই যে, তাহাদিগের মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যপতির সংখ্যা অল্প থাকে, এবং যাহা থাকে তাহাও অন্য রেগুলার দল হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়াই দেওয়া হয়। এই কারণেও ইউরোপীয় সেনাপতির সংখ্যা দলপ্রতি পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছিল।

এইরূপে সৈনিকগণ সুযোগ্য এবং যথাসংখ্যক অধিনায়কবিহীন হইয়াছিল। অথচ সর্ব্বত্র রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলাও সম্পাদিত হইয়া উঠে নাই। যাঁহাদিগের প্রতি শাসনকর্তৃত্ব সমর্পিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রায় সকলেরই প্রতি অযথা ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। চারি জনে য[illegible] করিতে না পারেন, এক একজনের উপর এত অধিক কাজের ভার দে[illegible] হইয়াছিল। এরূপ হওয়াতে যাঁহারা কেবল কাজ চালাইয়া দিতে চান, কাজটী ভাল হইল কি না দেখিতে চাহেন না, এমন সকল লোকে যেন তেন প্রকারে আফিস দোরস্ত করিতেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ন্যায়পরায়ণ অথবা বিমৃষ্যকারী তাঁহারা কাজ চালাইয়া দিতে পারিতেন না [illegible] মধ্যে মধ্যে ধমক খাইতেন। যাহা হউক, যিনি যেরূপে কাজ চালান [illegible] কেন, নূতন সংগৃহীত প্রদেশগুলির মধ্যে রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইতেছে না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিতেছিলেন। কেবল মাত্র পঞ্জাব প্রদেশে ওরূপ হয় নাই। এখানে যথাসংখ্যক লোক দেওয়া হইয়াছিল, ভাল লোকও দেওয়া হইয়াছিল, আর তাহা দিয়াও ডেলহৌসি স্বয়ং ঐ প্রদেশের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাতে পঞ্জাবের অবস্থাই ভাল রহিয়াছিল, অপর সর্ব্বত্র আর তেমন সুশৃঙ্খলা ছিল না।

রাজ্যের অভ্যন্তরশাসন যে কেমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষায় অতি প্রকাণ্ড বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটনাই তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তদ্ভিন্ন গুম সহর প্রদেশেও ঐরূপ একটি ক্ষুদ্র

ঘটনা ঘটে। বোদের রাজা ছোকরা বিশি নামক একজন ডাকাইতকে প্রতিপালন করিয়া তাহার দ্বারা চতুর্দ্দিক লুঠিয়া আনিতেন। এই ডাকাইতের দমনেও গবর্ণমেণ্টকে বিলক্ষণ পরিশ্রান্ত হইতে হইয়াছিল।

লর্ড ক্যানিঙ বাহাদুর রাজ্যের এই অবস্থায় শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ্যের অভ্যন্তর এরূপ বিশৃঙ্খল এবং বলহীন হইলে বাহে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। প্রত্যুত রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ হওয়াতে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রতি বর্ষে সাড়ে পাঁচ কোটী করিয়া টাকা এদেশে আসিতেছিল, এবং তাহা আসাতে ফ্রান্স এবং বেলজিয়ম এই উভয় দেশেই রৌপ্য মুদ্রার সংখ্যা এত ন্যূন হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার একটা কিছু প্রতিবিধানের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সুবর্ণ মুদ্রা চালাইবার প্রথম প্রস্তাব ঐ সময়ে এবং ঐ জন্যই উপস্থিত হয়।

বাণিজ্যের এরূপ বৃদ্ধি হওয়াতে এখানকার রেলওয়ের কার্য্যও উত্তমরূপে চলিতেছিল, এবং বিলাতের কোম্পানী রেলওয়ে বাড়াইবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীর মূলধনের শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ ডিরেক্টারেরাই স্বীকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং কোম্পানির লোকেরা যত টাকা ব্যয় হইল বলিয়া দিবে কোম্পানি ঐ হারে ততই সুদ পাইবেন, এরূপ ব্যবস্থা থাকায় রেলওয়ের খরচ ন্যায্য হইতেছে, কি অন্যায্য হইতেছে তাহা আর কেহই তেমন যত্ন করিয়া দেখিতে ছিল না। অজস্র অর্থ ব্যয় হইয়া যাইতেছিল। গবর্ণমেণ্ট এই সকল দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, রেলওয়ে কোম্পানির লাভ হউক, লোকসান হউক, পাঁচ টাকা হারে সুদ দিতে স্বীকার করিয়া বিবেচনার কর্ম্ম হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের স্ব-ব্যয়েই রেলওয়ে প্রস্তুত করা বিধেয়। কিন্তু সে সময়ে ঐ কথার প্রস্তাব মাত্র হইল, উহা কোন কার্য্যে পরিণত হইল না। বাণিজ্যের অংশ বৃদ্ধি হওয়াতে অপর একটী কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভাগীরথীর সর্ব্বত্র সমান গভীর নয়। যদিও জাহাজ যাতায়াতের পথ "বয়া"র দ্বারা স্পষ্টরূপে চিহ্নিত

হইয়া আছে, তথাপি স্রোতোবেগে বালির চুর একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়াতে কখন কখন ঐ পথের ব্যতিক্রম ঘটে, এবং সেই সকল সময়ে জাহাজ চরে সম্বদ্ধ হইয়া যায়। এই অনিষ্ট নিবারণের উদ্দেশে বণিক সম্প্রদায় হইতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল যে, কলিকাতার অন্যূন ত্রিংশৎ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মাতোয়ালা নামে যে সুবৃহৎ নদীপ্রবাহ আছে, তাহার উপকূলে একটি বাণিজ্য বন্দর নির্ম্মিত হউক। জাহাজ সকল কলিকাতায় না আসিয়া সেই বন্দরেই আসিবে। এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হওয়াতে মাতলা নগরের পত্তন হইল, এবং উহার নাম গবর্ণর জেনেরলের নামের অনুক্রমে পোর্টক্যানিঙ বা ক্যানিঙ বন্দর রাখা হইল।

ব্যবস্থাপক সমাজেও নানা প্রকারের ব্যবস্থা সমস্তের আন্দোলন হইতেছিল। হিন্দু বিধবা বিবাহের আইন প্রচলিত হইয়া গেল। এই ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লওয়া এ দেশীয় কৃতবিদ্যগণের বিশিষ্ট যত্নেরই ফল। বেণ্টিকের দ্বারা যে সতীদাহ নিবারিত হয়, রামমোহন রায় তাহাতে সহায়তা করিয়াছিলেন মাত্র, তিনি উহার প্রথম উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন না। কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া এই সময়ে যে বিধবাবিবাহের আইন চালাইয়া দিলেন, তাহার উদ্যোগ কর্ত্তাই ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। গ্রাণ্ট সাহেব ঐ সময়ে আরও একটী আইন চালাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সরকারি নিলামে জমিদারী বিক্রীত হইলে পত্তনি প্রভৃতি স্বত্ব লোপ না পাইয়া বজায় থাকে। গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবিত আইনের স্বপক্ষ মিসনরীদল এবং নীলকর সাহেবগণ— উহার বিপক্ষে দেশীয় জমিদারবর্গ। উভয় দল হইতেই অনেক দরখাস্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট পড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ মিসনরীরা রাইয়তদিগের একান্ত শুভানুধ্যায়ী হইয়া জমীদার এবং নীলকর উভয়কেই প্রজাপীড়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন।

গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবিত আইনটী প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও উহার বিষয়ে দুই একটী কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। গ্রাণ্ট সাহেব প্রস্তাব করেন যে, পত্তনিদার প্রভৃতি জমিদারের কোর্ফা স্বত্বা-

ধিকারীরা আপনাদের অধিকার রেজিষ্টরি করাইয়া যদি দেন, খাজনার সম পরিমাণ সুদের কোম্পানীর কাগজ কলেক্টরিতে জমা করিয়া দেন, তবে কলেক্টর সাহেব দেখিবেন যে উহাঁরা যে খাজনার জমিদারীর যত অংশ অধিকার পাইয়াছেন তাহা যথাযথ হইয়াছে কি না, এবং যথোচিত হইয়াছে বুঝিলে ঐ পত্তনি রেজেষ্টারি করিবেন। তখন জমিদারীর নিলাম হইলেও আর ঐ রেজিষ্টরি স্বত্ব লোপ পাইবে না।

এই আইন চলিলে বড় বড় জমিদারী ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হইত। এরূপ করায় উপকার আছে বলিয়া তখনকার রাজপুরুষদিগের বোধ হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বড় জমিদারী ছিল না, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রণালীই উৎকৃষ্ট বলিয়া সংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। মান্দ্রাজ প্রদেশে জমিদারী প্রণালী প্রচলিত নাই। সেখানে সকল ভূমিই গবর্ণমেণ্টের খাসে থাকে, এবং গবর্ণমেণ্ট বেতনভোগী তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব আদায় করেন। "কিন্তু তাহা করাতে প্রজাপীড়ন যৎপরোনাস্তি হয়, প্রজাদিগকে যথেষ্ট শারীর যন্ত্রণা দিয়া খাজনা আদায় করিতে হয়।" এই সকল কথা তখন নূতন নূতন প্রকাশ হওয়াতে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডেও তাহার আন্দোলন হইয়া তখন কোম্পানী বাহাদুরের অনেক নিন্দাবাদ হওয়াতে মান্দ্রাজ প্রচলিত রাইয়তওয়ারি বন্দোবস্তের সাক্ষাৎ প্রশংসা কেহই করিতে পারিতেন না। কিন্তু লর্ড করণওয়ালিস প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালার জমিদারী বন্দোবস্ত অনেকেরই বিষচক্ষে পড়িয়াছিল। তাঁহারা মনে করিতেন যে মান্দ্রাজ এবং বাঙ্গালায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার বন্দোবস্তের মধ্যবর্ত্তী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ফলকথা, যে সময়ে ভারতবর্ষীয় রাজগণ তিরস্কৃত এবং অপহৃতসর্ব্বস্ব হইয়া লণ্ডন নগরে নালিস করিবার নিমিত্ত গিয়াছিলেন, যে সময়ে কুর্গের মহীপতি, খয়েরপুরের নবাব, কর্ণাটের নবাব, নাগপুরের রাজরাণী সকলে, সুরটের নবাব বাজীরাওয়ের উত্তরাধিকারিগণ, অযোধ্যা রাজমাতা, কেহ স্বয়ং কেহ বা মুক্তিয়ারদিগের দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের দ্বারে আপনাপন অভি-

যোগপত্র লইয়া উপস্থিত এবং যে সময়ে ঐ সকল সম্ভ্রান্ত লোকের প্রতি ইং-লণ্ডের দয়ারও নিতান্ত অভাব সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা প্রদেশ প্রচলিত জমিদারী প্রণালীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের কটু কটাক্ষ এবং বড় বড় জমিদারী চূর্ণ করিবার চেষ্টা। গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবিত আইনটী ঐ চেষ্টারই একটী লক্ষণ মাত্র। উহা রাজকর্ম্মচারীদিগের তাৎকালিক প্রবল অভিমতির চিহ্ন বিশেষ।

নচেৎ গ্রাণ্ট সাহেবের ন্যায় বুদ্ধিজীবী মহানুভব ব্যক্তি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহার আইন চলিয়া গেলেও বিশেষ ফললাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কি নীলকর কি জমীদার কি পত্তনিদার কোন দলের লোকেরই এত অর্থ সংস্থান ছিল না যে খাজনার সম পরিমাণ সুদের কোম্পানীর কাগজ জমা রাখিতে পারেন। যদি এখনকার লোকদিগের সে ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে কোন্ কালে কলিকাতার ভূমি নিষ্কর হইয়া যাইত। ১৮১৯ অব্দে নিয়ম করা হয় যে, ১৫ সনের মালগুজারি জমা করিয়া দিলেই কলিকাতার ভূমির আর খাজনা দিতে হইবে না। ঐ নিয়মে কোন ফলই হয় নাই। তাহার পর ১৮২৪ অব্দে নিয়ম করা হয় যে, ৭৷৷০ বৎসরের খাজনা জমা করিয়া দিলে ১০ বৎসরের খাজনা সাফ হইবে, ১৫৷৷০ বৎসরের দিলে ৩০ বৎসরের সাফ হইবে। সে নিয়মেও কোন ফল দর্শে নাই। অনন্তর ১৮৫৩ অব্দে নিয়ম হয় যে ২০ বৎসরের মালগুজারি দিলে একেবারে নিষ্কর হইবে। তাহাতেও কিছু হয় নাই। পরে ১৮৫৪ অব্দে নিয়ম হয় যে ১৫ বৎসরের দিলেই হইবে। তাহাতেও কিছু হয় নাই। যদি দেশে তেমন অধিক ধন থাকিত তাহা হইলে কি ঐ প্রকার বিফলতা হয়?

সুন্দরবনের আবাদ করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ যত্ন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতেও অধিক মূলধনের প্রয়োজন বলিয়া ঐ আবাদ সত্বরে সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিল না। ১৮১৫ অব্দে গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করেন যে, সুন্দরবনের ভূমি আবাদ করিলে কখন বিঘা প্রতি আট আনার উর্দ্ধ কর লইবেন না। এ নিয়মে কোন কাজ হয় নাই। পরে

১৮২৫ অব্দে নিয়ম করেন, যে, যত ভূমিতে আবাদ হইবে তাহার বার আনার উপর বিঘা প্রতি আট আনার উর্দ্ধ খাজনা লইবেন না, এবং সিকি চিরকাল নিষ্কর ছাড়িয়া দিবেন। ইহাতেও কিছু হইল না। ১৮২৯ অব্দে পুনর্ব্বার নিয়ম করিলেন যে ২০ বৎসরের মধ্যে আদবেই খাজনা লইবেন না। তাহাতেও কিছু হইল না। অনন্তর ১৮৫৩ অব্দে নিয়ম হইল যে, ৫ বৎসরের মধ্যে ২ আনা, ১০ বৎসরের মধ্যে ৪ আনা, ২০ বৎসরে ৮ আনা, ৩০ বৎসরে ১২ আনা প্রমাণ ভূমির আবাদ করিতে হইবে এবং ৯৯ বৎসরের নিমিত্ত বিঘা প্রতি ২ আনা হিসাবে খাজনা দিতে হইবে। ঐরূপ পুনঃ পুনঃ আবাদকারীদিগের অনুকূল নিয়ম করিয়াও যখন দেশে অর্থাভাব বশতঃ বিশেষ কাজ হইতেছিল না, তখন যে পত্তনিদারেরা অনেকে কোম্পানীর কাগজ জমা করিয়া দিয়া প্রস্তাবিত আইনের ফল ভোগে সমর্থ হইতেন এরূপ বোধ হয় না।

তবে একটী ফল ফলিতে পারিত। ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এখানকার ভূমি সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিতে পারিতেন এবং তাহা দিলে বাঙ্গালা প্রদেশের অনেকানেক ভূম্যধিকার ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়দিগের হস্তগত হইয়া যাইত। পত্তনী বিলি করিবার নিয়ম থাকাতে তাহাও যথেষ্ট হইয়া আসিতেছে। উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে আরও সত্বরে এবং বিশিষ্টরূপেই হইত। এদেশীয় জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা উপস্থিত হওয়াতেই যে ঐ ব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না।

যাহা হউক, রাজ্যটী যে প্রকৃত পক্ষে কতক বিশৃঙ্খল এবং একটু বলহীন হইয়াছিল তাহার লক্ষণ সত্বরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্যয়ের অকুলান পড়িল এবং ক্যানিং বাহাদুরকে ৫৭ অব্দের প্রারম্ভেই একটী ৫৲ টাকার কাগজ খুলিয়া ঋণ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই সময়ে রুসিয়ার একান্ত পক্ষপাতী পারসিক সম্রাট ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া হিরাট নগর আক্রমণ পূর্ব্বক তাহা অধিকৃত করিলেন। চীন দেশেও কাণ্টন নিবাসিগণ ইংরাজ বণিকদিগকে আপনাদিগের নগর

প্রবেশ নিষেধ করিল এবং তাঁহারা নিষেধ অমান্য করিলে অনেক উপদ্রব করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের গৃহাদি সহিত ইংরাজদিগের অনেক কুঠী জ্বালাইয়া দিল। অতএব ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকে একেবারে দুইটী যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

এদিকে ইংরাজদিগের সিপাহী সৈন্যগণ যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল ভাবাপন্ন হইতেছিল। তাহারা নিরন্তর এই ভয় করিতেছিল যে, কোম্পানী বাহাদুর তাহাদিগের ধর্ম্ম লোপ করিবেন। ভয়ের কারণ এই তাহারা জানিয়াছিল যে ভারতবর্ষের মধ্যে আর একটীও স্বাধীন রাজ্য নাই, অতএব মনে করিতেছিল যে, ইংরাজেরা এইবারে ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইবেন। কিন্তু ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলেই হিন্দুরা জাতিভ্রষ্ট হন। অতএব হিন্দু সেনাগণের জাতি না মারিলে আর চলিবে না। বিশেষতঃ সিপাহীরা দেখিয়াছিল যে তাহাদিগের মধ্যে এক দল পেগু অধিকার করিবার নিমিত্ত যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর স্থানীয় কার্য্যের নিমিত্ত সৈনিক নিযুক্ত করিবেন না। সকল সেনাকেই সর্ব্বদেশে যাইতে স্বীকার করাইয়া তবে নিযুক্ত করা হইবে। ইহাতেও সিপাহিগণ বুঝিয়াছিল যে তাহাদিগের জাতি নাশ করাতেই গবর্ণমেণ্টের ইষ্ট সাধন সম্ভাবনা।

সিপাহীগণ এই প্রকার শঙ্কাকুলিত হইয়া আছে, এবং দেশের ধর্ম্ম বিচারের যথেষ্ট আন্দোলন হইয়া সকলের মন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে এমত সময়ে একটী সামান্য ঘটনা উপস্থিত হইল। দমদমার বারিকে যে সকল সৈনিক থাকে তাহার মধ্যে একজন হিন্দু সিপাহীর একটী জলপাত্র একজন মুসলমান খালাসি লইতে যায়। সিপাহী তাহাতে ক্রুদ্ধ হয়। খালাসি বলে, "তোদের আবার জাতির বড়াই কি—তোরা কাওয়াজের সময় দাঁতে করিয়া যে টোটার কাগজ কাটিস, তাহাতে গোরুর চর্ব্বি দেওয়া থাকে; তোদের আর কি জাতি আছে না থাকিবে?" এই সামান্য কথা লইয়া তুমুল আন্দোলন পড়ে। সিপাহীদিগের মনে পূর্ব্ব হইতেই শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, এখন সেই শঙ্কাটী যে সত্য তাহার চিহ্ন

প্রকাশ পাইল। বারুদ জমা হইয়াছিল, তাহাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িল। একেবারে সমুদায় জ্বলিয়া উঠিল। তাদৃশ বিচক্ষণ এবং বিশ্বাস্য সৈন্যপতিও প্রায় ছিল না যে সে আগুন থামাইবে। দেশ জ্বলিয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে ঐ টোটার কাগজে চর্ব্বি আছে বটে, আর ঐ টোটা ব্যবহার করিতে হইবে না। কিন্তু সিপাহীরা আর নিবৃত্ত হইতে পারিল না। প্রথমে বারাকপুরের সৈন্যেরা ক্ষেপিয়া উঠে, তাহার পর বহরমপুরে গোল-যোগ উপস্থিত হয়; অনন্তর দানাপুরে, শিয়ালকোটে এবং অমৃতসরে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পায়। দুইটী রেজিমেণ্টকে বারাকপুর হইতে কার্য্যচ্যুত করা হইল। যেন একবার আগুন থামিল। কিন্তু আবার দিন কয়েকের মধ্যেই মিরাটের সৈনিকেরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের অধিনায়কগণকে বিনাশ করিল এবং দিল্লীর বাদসাহকে সাম্রাজ্য প্রদান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া দিল্লী নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। আর সহজে বিদ্রোহ শান্তির উপায় রহিল না। বিদ্রোহীরা একটী উদ্দেশ্য পাইল, পরস্পর সম্মিলিত হইবার একটী স্থান পাইল। সিমলা পর্ব্বতে যে গুর্খা সিপাহী দল ছিল তাহাদিগেরও জাতি যাইবার বিশেষ ভয় ছিল না। তাহারাও আপনাদিগের সৈন্যপতিকে নষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টের ধনাগার লুঠ করিল। হোলকারের সৈনিকদল, সিন্ধিয়ার সৈনিক দল, লক্ষ্ণৌ নগরস্থ সৈনিক দল সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিল। সমস্ত সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিপাহীরা যেখানে যেখানে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত সেই সেই স্থানেই ধনাগার লুঠ করিত এবং কারাগৃহ উন্মুক্ত করিয়া দিত। দেশের বদমাইস সকল বাহির হইয়া কত যে অত্যাচার এবং কত যে নিষ্ঠুরাচরণ করিল তাহা বর্ণনা করিবার নহে। আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইউরোপীয় মাত্রের আর রক্ষা ছিল না। সিপাহীরা নিতান্তই বুঝিয়াছিল যে. ইংরাজ রাজত্বের এক শতাব্দীকাল পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর ইংরাজের অধিকার থাকিবে না। ইংরাজেরাও ভয়ে ক্রোধে অপমানে একান্ত অব-সন্নের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাঁহারা যেখানে সাক্ষাৎ বিপদ মুখে পড়িয়াছিলেন তাঁহারা বিলক্ষণ সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন

করিয়াছিলেন। আগ্রা নগরে, লক্ষ্ণৌ নগরে, এবং দিল্লীতে, ইংরাজ জাতির অনেক ধীরতা প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা নিবাসী ইংরাজেরা কিছুমাত্র ভয়ের হেতু না থাকিলেও এত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এত অধীরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকেও নিতান্ত উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। ইংরাজী সংবাদ পত্র সকলে এতদ্দেশীয় লোক দিগের প্রতি এত প্রখরতর বিদ্বেষ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল যে, কানিং বাহাদুর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু তাহা করাতে কলিকাতা নিবাসী স্বাধীন ইংরাজদিগের ক্রোধ বড় সাহেবের উপরেই পড়িল। ঠাট্টা করিয়া তাঁহার নাম ক্লেমেন্সি কানিঙ্ অর্থাৎ দয়াল কানিঙ্ রাখা হইল এবং তাঁহার প্রধান সভাসদ গ্রাণ্ট সাহেবকে হোয়াইট পাণ্ডে বা পাঁড়ে সাহেব বলা হইতে লাগিল। ইংরাজদিগের স্বভাবে এবং এতদ্দেশীয় লোকের স্বভাবে একটা বৈচিত্র্য এই যে,এখানকার লোকেরা চুপ করিয়া মারি খাইতে পারেন কিন্তু ইংরাজেরা চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না,তাঁহারা মুখপূরে গালি দিতে না পাইলে বড়ই কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন। মুদ্রাযন্ত্রের-স্বাধীনতা যাওয়াতে গালি দিবার কতক ব্যাঘাত হইল, অতএব ইংরাজদিগের ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিল।

গবর্ণমেণ্ট এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এদেশীয় সকল লোককেই রাজবিদ্রোহী বলিয়া মনে করেন না; যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত, কেবলমাত্র তাহারাই দোষী এবং দণ্ডার্হ। সকল লোককে নিরস্ত্র করিবার আইন প্রচারের সময় তাঁহারা দেশীয় বা ইউরোপীয় বলিয়া কোন বিশেষ করিলেন না। কিন্তু তাহা না করাতেই ইংরাজদিগের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা দিতে লাগিলেন যে, যাহারা স্বেচ্ছাতঃ বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই,অন্য কর্তৃক প্রলোভিত অথবা ভয় প্রদর্শিত হইয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছে এমত সকল লোক অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে। স্বাধীনবৃত্তি সংসৃষ্ট ইংরাজেরা ক্ষমার নাম মাত্র শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে লর্ড কানিঙ বাহাদুর যেরূপ ধীরতা এবং প্রাজ্ঞতা অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এই সময়ে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষুই লর্ড কানিঙের উপরে পড়িয়াছিল এবং ইংলণ্ড এই সমূহ বিপদ সাগর হইতে কিরূপে উদ্ধার হইবেন পৃথিবীর সকল জাতি যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মার্কিনেরা বলিতেছিলেন, যদি ইংলণ্ড ভারত রাজ্য হারান, তাহা হইলে পৃথিবীর মধ্যে যে উচ্চতম আসন পরিগ্রহ করিয়া আছেন তাহাও হারাইবেন। ভারতবর্ষ হস্তবহির্ভূত হইয়া গেলে ইংলণ্ড আর আমাদিগের সমকক্ষ হইয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিবেন না। আমাদিগেরও বাণিজ্য ব্যবসায়ের সমূহ ক্ষতি হইবে। অষ্ট্রীয়া এবং রুসিয়া বলেন, ইংলণ্ডের বড়ই অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই জন্যই তাঁহার প্রতি এই বিপৎপাত হইয়াছে। জর্ম্মনি ইংলণ্ডের সাহসিকতা এবং ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের পরম সুহৃৎ ফ্রান্স সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ান স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছিলেন, ভারত সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের হস্তবহির্ভূত হইবে না। এই বলিয়া তিনি স্বয়ং সৈনিক প্রেরণ দ্বারা ভারত রাজ্যের পুনরধিকার বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকার করেন। ঐ সাহায্য গ্রহণে ইংরাজেরা অসম্মত হইলে তৃতীয় নেপোলিয়ন অপর একটি সৎকার্য্য করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহে যতলোক নষ্ট হইয়াছিল তাহাদিগের পরিজনবর্গের সংস্থান করিবার জন্য যে চাঁদার ফর্দ্দ হয় সেই ফর্দ্দে তিনি নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া যথেষ্ট চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তৃতীয় নেপোলিয়ন বাস্তবিকই ইংলণ্ডের পরম বন্ধু ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় নিজ ইংলণ্ডের মধ্যেও মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যেরা বিশেষ বিচক্ষণতা সহকারে একপক্ষে বিদ্রোহ দমনের উপায় বিধান করিতে লাগিলেন, পক্ষান্তরে এরূপ ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। এক প্রকার নিশ্চিত হইল যে, ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজ্য সমস্ত গ্রাস করিয়া ফেলা এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণাদি ক্ষমতায় রাজাদিগকে বঞ্চিত

রা আর প্রজাদিগের ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ প্রকাশপূর্ব্বক ষ্টান ধর্ম্মের প্রচার করিবার চেষ্টা করা—এই সকল কারণে এই বপৎপাত হইয়াছে। ডালহৌসি বাহাদুর যে অনেক অকার্য্য করিয়াই য়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইল। ইংরাজজাতির মন যে ভাবে াড়াইয়াছিল তাহা আবার ফিরিল। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে, াজ্যের বিস্তার এত সত্বর বর্দ্ধিত করিয়া সৎ পরামর্শের কার্য্য হয় নাই। কান কোন মহাপুরুষ ভাবিলেন যে, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ইংলণ্ডের বল- ত্তার পক্ষে সহায় না হইয়া প্রত্যুত ইহার দৌর্ব্বল্যেরই কারণ হইয়া াছে। কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন রাজ্যের বিস্তার পুনর্ব্বার সঙ্কুচিত রাই বিধেয়।

কিন্তু সুবোধ এবং বহুদর্শীদিগের মধ্যেই ঐ মতি পরিবর্ত্ত প্রথম হইতে ক্ষিত। সাধারণ ইংরাজ—কি ইংলণ্ডের কি এখানকার—সকলেরই খ ক্রোধ বই আর কিছুই ছিল না। কোন কোন ইংলণ্ডীয় সংবাদ পত্রে ম্নলিখিত উপদেশ সমস্ত প্রদত্ত হয়। "মার—মহাপাতকী মহানারকী রতবর্ষনিবাসী মাত্রকে সমূলে নিপাত কর।" "মহম্মদের এবং বিষ্ণুর বকদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা যেমন পশু, আমরা হাদিগকে পশুর ন্যায় বধ করিব।" "ভারতবর্ষীয়রা যতগুলি ইউরো- য় মারিয়াছে সেই ইউরোপীয়দিগের মাথায় এবং গাত্রে যতগুলি করিয়া াম ততগুলিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে হইবে।"

যে সকল সৈন্য ইংলণ্ড হইতে আসিতেছিল তাহারা ঐরূপ উপদেশ বাক্য াণ করিয়া আসিল। এখানে আসিয়া তাহারা যে যথাসাধ্য ঐ সকল াদেশের অনুসারেই চলিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। সৈনিক হ্ পক্ষীয়েরা যেখানে যাইতেন আপনারাই দোষাদোষের বিচার করিয়া াকের ফাঁসি দিতেন। কানিঙ্ বাহাদুর ঐরূপ প্রজা বিনাশের অনেক ারণ চেষ্টা করিতেছিলেন এবং পরিশেষে কতক দূর কৃতকার্য্য হইয়া- লন।

অব্যবস্থিতচিত্ত এবং অধিনায়কবিহীন সিপাহীদল ক্রমে ক্রমে পরা-

ভূত হইয়া গেল। দিল্লী পুনর্ব্বার ইংরাজের অধিকৃত হইল। আগ্রা এবং লক্ষ্ণৌএর অবরোধ মোচন হইল। এবং শিখ, গুর্খা, মান্দ্রাজী এবং ইংলণ্ডের নবাগত সৈন্য সমস্ত আসিয়া পড়াতে বিদ্রোহের যে ভয়ঙ্কর ঘটা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কাটিয়া গেল।

সমস্ত বাঙ্গালা বিভাগের সৈনিকগণের বিদ্রোহ ব্যাপার সংক্ষেপে লিখিত হইল। নিজ বাঙ্গালা প্রদেশের মধ্যে ওরূপ ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা ঘটে নাই বটে, কিন্তু এখানকার সৈনিকেরাও প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। প্রথমে গয়া নগরে একটু ভয় উপস্থিত হয়, অনন্তর পাটনার একজন পাদ্রি সাহেবের বাটীতে আক্রমণ হয়, তাহার পর ঢাকায় কিঞ্চিৎ গোলযোগ উঠে, পরে সাঁওতাল পরগণার মধ্যে রোহিণি নগরে সিপাহীরা স্পষ্ট বিদ্রোহ করে। এইরূপ নানা স্থানে শঙ্কার উদ্রেক হইতেছে, এমত সময়ে দানাপুরের তিনটী রেজিমেণ্ট একবারে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সাহাবাদ পরগণার প্রসিদ্ধ জমীদার কুমার সিংহের নিকটে গিয়া তাঁহাকে আপনাদিগের অধিনায়কতায় নিযুক্ত করে, এবং তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আরা নগর আক্রমণ করিতে আইসে। আরার অবরোধের মধ্যে একদল ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদিগের দ্বারা পরাভূত হয়। অনন্তর অপর একদল ইউরোপীয় সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করে। ইহার পর সিগৌলির সৈন্যদল বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। ঐ দল বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে শুনিয়াই পাটনা বিভাগের কমিশনর ভীত হন এবং বিভাগের সর্ব্ব স্থান হইতে ইউরোপীয় কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া সকলকেই পাটনার মধ্যে রাখেন। এরূপ করাতে গয়া, চম্পারণ, মতিহারি, নওদা, মজফরপুর প্রভৃতি সকল স্থানে নিতান্ত অরাজকতা হইয়া পড়ে।

এই দোষে টেলার সাহেবের কর্ম্ম যায় এবং তাঁহার স্থানে সামুয়েল সাহেব কমিশনর এবং মুনসি আমির আলি ডেপুটী কমিশনর হইয়া যান। ইহার পর হাজারিবাগে, অনন্তর পুরুলিয়াতে এবং পরিশেষে ভগলপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সকল বিদ্রোহ ব্যাপার তত্তৎ স্থানে

স্থায়ী হয় নাই। সিপাহীরা স্ব স্ব স্থান ত্যাগপূর্ব্বক কিছু লুঠপাট করিয়া আপনাদের কোন বৃহত্তর দলের অন্বেষণেই প্রস্থান করিত। তাহারা পথের মধ্যেও বড় অধিক দৌরাত্ম্য করিত না। কোনরূপে একটী বৃহত্তর দলের সঙ্গে যাইয়া মিশিতে পারিলেই যেন নির্ভয় হয়, এই ভাবেই চলিত।

বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল কাণ্ডের মধ্যে যে প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণ সময়োচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। প্রকাশ্যে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহার প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শন করা হয় নাই। এমন কি একজন মুসলমানকে ঐ সময়ে ডেপুটী কমিশনরের কর্ম্ম পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু গোপনে গোপনে পুলিসের কর্ম্মে দেশীয় খৃষ্টানদিগকেই অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বিদেশীয় লোক এবং বিশেষতঃ বিদেশীয় ছোট লোক আনিয়া তাহাদিগের দ্বারা অশ্বারোহী পুলিশ দল সৃষ্টি করা হইয়াছিল। কোথাও মগ, কোথাও সাঁওতাল, কোথাও কোল অধিক পরিমাণে লইয়া নূতন পুলিসের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বিহার প্রদেশে যে কুড়িটী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হইয়াছিল তাহাদিগের বেতন ২০০ শত হইতে ৭০০ শতপর্য্যন্ত করিয়া দিয়া ইউরোপীয়দিগকেই ঐ সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বঙ্গবাসীরা স্বজাতির মায়া যতই ছাড়ুন ইংরাজেরা কখনই মনে করিতে পারেন না যে, বাঙ্গালীরা মনে মনে স্বদেশীয়দিগের পক্ষতা একান্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। খৃষ্টান না হইলে অমন সকল সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হওয়া বড় কঠিন।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ দমনার্থ ক্রমে ক্রমে * পাঁচটি আইন প্রচলিত করিয়া মার্সিয়াল আইন অপেক্ষাও অধিকতর কঠিনরূপে দেশের শাসন করিতে লাগিলেন। একটি আইনের দ্বারা (১) বিদ্রোহী মাত্রেই প্রাণদণ্ডার্হ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডযোগ্য হইল এবং একটি কমি-

* ১৮৫৭ সালের ৩০শে মে হইতে ৮ই আগষ্টের মধ্যে

(১) ১৮৫৭ সালের ১১ আইন।

শন বসাইয়া বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে নিষ্পত্তি করিবার পূর্ণ ভার তৎপ্রতি অর্পিত হইল। আর একটি আইনের দ্বারা (১) বিদ্রোহের প্রশ্রয় দাতা মাত্রে বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইল। তৃতীয় আইনের দ্বারা (২) সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাহারা বিদ্রোহের কোন ছন্দাংশে থাকিবে অথবা যে কোন প্রকার গুরুতর অপরাধ করিবে তাহারাও এক প্রকার বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য হইল। চতুর্থ আইনের (৩) অনুসারে বিদ্রোহিগণ উল্লিখিত কমিশনের বিচারাধীন হইল; এবং হুকুমের পরক্ষণেই অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইয়া যাইতে পারিবে এরূপ ব্যবস্থা হইল। (৪) পঞ্চম আইনের দ্বারা বিদ্রোহীর সম্পত্তি রাজকোষসম্ভুক্ত হইতে পারিবে এই বিধি হইয়া গেল।

লক্ষ্ণৌ অধিকৃত হইয়া গেলে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর একটি ঘোষণা পত্র প্রচার দ্বারা অযোধ্যা প্রদেশীয় যাবৎ ভূম্যধিকারীর ভূমি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। এরূপ কাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসের অপর কোন স্থলে দৃষ্ট হয় নাই। এই ঘোষণাপত্র লইয়া ইংলণ্ডেও সমূহ বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। অনন্তর উহা রহিত করা হয়।

ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবর্ষীয় বিদ্রোহ ব্যাপার লইয়া যৎপরোনাস্তি গোলযোগ পড়ে। পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষকে ইংরাজদিগের আয়ত্তে রাখিবার জন্য বিধিমতেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক টাকা এবং অনেক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহা দিয়া অবধি ভারতবর্ষীয় শাসন কার্য্যের প্রতি বিশেষরূপেই দৃষ্টিপাত হইল, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ছাড়াইয়া মহারাজ্ঞী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্রী হইলেন।

১৮৫৮ অব্দের ১লা নবেম্বর উল্লিখিত ঘোষণা কলিকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে প্রচারিত হইল। ঘোষণা পত্রের তাৎপর্য্যার্থ অনুবাদ এই—

---

(১) সালের ৪ আইন।
(২) „ ১৬ আইন।
(৩) „ ১৭ আইন।
(৪) „ ২৫ আইন।

"ঈশ্বরকৃপায় আমি (শ্রী ভিক্টোরিয়া) গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র-রাজ্যের ও তদধীন ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেশি-য়ার অন্তর্ভুক্ত উপনিবেশ ও অপরাপর প্রদেশ সমূহের রাজ্ঞী ও খৃষ্ট ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী।

গুরুতর বিভিন্ন কতিপয় কারণ বশে আমি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার যাজক, জমিদার ও সাধারণ সভা মণ্ডলীর পরামর্শ ও অনুমোদন ক্রমে মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিব মনে করিয়াছি।

অতএব এক্ষণে আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে, উল্লিখিত পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে আমি ঐ শাসন ভার গ্রহণ করিলাম। ভারতবর্ষীয় প্রজাগণ যেন আমার ও আমার পরবর্ত্তিগণের প্রতি প্রকৃত রাজভক্তি প্রদর্শন করেন এবং আমার স্বার্থ রক্ষার জন্য আমার প্রতিনিধি স্বরূপে সময়ে সময়ে আমি যে সকল শাসন কর্ত্তাকে উক্ত রাজ্য শাসনের জন্য নিযুক্ত করিব তাঁহাদিগের ক্ষমতাও মান্য করিয়া চলেন।

সুবিশ্বস্ত প্রিয়সচিব শ্রদ্ধাভাজন ক্যানিং মহোদয়ের রাজভক্তি, কার্য্য-কুশলতা ও সুবিবেচনায় আমার বিলক্ষণ আস্থা আছে। এই জন্য ভারতের রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাকেই উক্ত রাজ্যের সর্ব্বপ্রথম রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমারই জনৈক প্রধান সচিব দ্বারা সময়ে সময়ে আমি যেরূপ উপদেশ দিব তদনুসারে কানিং বাহাদুর সাধারণতঃ আমারই স্বার্থ রক্ষার জন্য আমারই প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিবেন।

মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে যে সকল সৈনিক ও শাসন সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদেই নিযুক্ত রাখিলাম। অতঃপর যে সকল ব্যবস্থাদি প্রণীত হইবে তদনুসারে এবং আমার ভাবী ইচ্ছার উপর তাঁহাদিগের এই মর্য্যাদা নির্ভর করিবে।

ভারতের দেশীয় রাজগণ সম্বন্ধে আমি এই ঘোষণা করিতেছি যে, মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক অথবা তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে

সকল সন্ধিপত্রাদি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেই সকল আমার গ্রাহ্য হইল এবং আমি ঐ সমস্ত অব্যাহত রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিব। আশা করি উক্ত দেশীয় রাজগণও তদ্রূপ করিবেন।

বর্ত্তমান রাজ্যাধিকার বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। অপরে আমার স্বার্থে হস্তক্ষেপ যাহাতে না করিতে পারে তাহা আমাকে দেখিতে হইবে, এবং অপরের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিবার পক্ষে আমার কর্ম্মচারিগণকে কোন রূপ ক্ষমতা দেওয়াও আমার অনুমোদিত হইবে না। দেশীয় রাজগণের স্বত্বাধিকার, পদমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম আমাদের নিজেদের স্বত্বাধিকার পদমর্য্যাদা ও সম্ভ্রমের তুল্য জ্ঞান করিব। আভ্যন্তরিক শান্তি এবং সুশাসনগুণেই রাজ্যের সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি হয়। আমার ইচ্ছা, উক্ত দেশীয় রাজগণ এবং আমার অপরাপর প্রজাবর্গও যেন সেই উন্নতি এবং সমৃদ্ধি উপভোগের পথ সুপরিষ্কৃত রাখেন।

অপরাপর রাজ্যের প্রজাবর্গের সম্বন্ধে আমার যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, ভারতের প্রজার সম্বন্ধেও আমি সেই সকল কর্ত্তব্যপালন করিতে বাধ্য বলিয়া আপনাকে মনে করি এবং জগদীশ্বরের কৃপায় এই সকল কর্ত্তব্য আমি বিশ্বস্তভাবে এবং বিবেকবুদ্ধি প্রণোদিতা হইয়া পালন করিব।"

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ঐ ধর্ম্মে মনে যে শান্তি সুখ উপভোগ করি তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার কোন প্রজাকে বলপূর্ব্বক ঐ ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করাইতে আমার কোন রূপ অধিকার বা ইচ্ছা নাই। আমি এই রাজকীয় অভিপ্রায় প্রচার করিতেছি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাস অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম্য কার্য্যের নিমিত্ত কাহাকেও অনুগ্রহ বা নিগ্রহভাজন হইতে হইবে না, সকলেই সমান এবং নিরপেক্ষভাবে আইনের আশ্রয় লাভ করিবেন। আমার কর্ম্মচারিগণ মধ্যে কেহ যেন আমার কোন প্রজার ধর্ম্ম বিশ্বাস বা ধর্ম্ম-কার্য্যে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে তাঁহাকে আমার বিশেষ অসন্তোষের ভাজন হইতে হইবে।

আমার আরও ইচ্ছা যে,যে ধর্ম্মের বা যে জাতির হউক, আমার সকল প্রজাই অবাধে এবং বিনা পক্ষপাতে আপনআপন বিদ্যা,বুদ্ধি,কার্য্যকুশলতা ও সৌজন্য অনুসারে আমার কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হইতে পাইবেন।

পৈতৃক ভূমি সম্পত্তির উপর ভারতীয় প্রজাগণের যে কত দূর মমতা তাহা আমি জানি এবং ঐরূপ অনুরাগের আমি সম্মানও করি। সুতরাং সাম্রাজ্যের স্বার্থে কোনরূপ বিঘ্ন যাহাতে না জন্মে সে পক্ষে লক্ষ্য রাখিয়া এতৎসংক্রান্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখাই আমার ইচ্ছা। সাধারণতঃ, ভূমি সংক্রান্ত কোনরূপ আইন কানুনের সংগঠনস্থলে ভারতের প্রাচীন রীতি নীতি ও উত্তরাধিকার প্রথার দিকে যাহাতে বিশিষ্টরূপ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা হয়, সে পক্ষে আমি আদেশ দিতেছি।

কতকগুলা স্বার্থপর লোকে মিথ্যা কথা রটনা করিয়া স্বদেশীয়গণকে বিদ্রোহী করতঃ ভারতের যে অনর্থ ঘটাইয়াছে তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। সম্মুখ যুদ্ধে সেই বিদ্রোহের প্রশমনে আমার প্রতাপের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমস্ত স্বার্থপর লোকদিগের প্ররোচনায় ভুলিয়া যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে যাহারা পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য পথে প্রত্যাবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে তাহাদিগের অপরাধের ক্ষমা করিয়া তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতে আমি ইচ্ছা করি।

পুনরপি রক্তপাত আর যাহাতে না হইতে পায় এবং ভারত সাম্রাজ্যের শান্তি যাহাতে অপেক্ষাকৃত শীঘ্র সম্পাদিত হয় তজ্জন্য ইতিমধ্যেই একটি প্রদেশে আমার প্রতিনিধি ভারতের গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর অধিকাংশ রাজবিদ্রোহীকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন এবং অপরাধের গুরুত্ব নিবন্ধন যাহারা ক্ষমার পাত্র নহে তাহাদিগের প্রতি নিরূপিত দণ্ডের ঘোষণা করিয়াছেন। আমি উক্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের এই কার্য্যের অনুমোদন করি এবং আরও বলি—

যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজ হত্যায় যোগ দিয়াছিল তাহারা ব্যতীত আর সকল বিদ্রোহীকেই ক্ষমা করা হইবে। ঐরূপ হত্যাকারীদিগের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন যুক্তিবিরুদ্ধ।

"এই সকল লোক হত্যাকারী"—ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহারা উহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল অথবা যাহারা এই বিদ্রোহ ব্যাপারে দলপতি বা উৎসাহদাতা হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রাণে মারা হইবে না, তবে তাহাদিগের দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার সময়, কি অবস্থায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে এবং অপর লোকের মিথ্যা প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া যাহারা অপরাধী হইয়াছে তাহাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

আর আর যে সকল লোক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শান্তিমূলক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকুক, তাহাদিগের সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিলাম।

আগামী জানুয়ারী মাসের মধ্যে যাহারা আপন আপন সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিবে, উক্তরূপ ক্ষমা ও দয়া কেবল তাহাদিগের প্রতিই প্রদর্শিত হইবে, ইহাই রাজকীয় অভিপ্রায়।

আমার ইচ্ছা, জগদীশ্বরের কৃপায় যখন দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইবে, তখন আমি ভারতের শিল্পের উন্নতিসাধন এবং সাধারণের হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। ভারতের প্রজার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইলেই আমার বল বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের সন্তোষেই আমি নিরাপদ হইব, তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেই আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত বলিয়া মনে করিব। প্রার্থনা করি সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর এই সকল প্রজাহিতকর অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে আমাকে ও আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে উপযুক্তরূপ শক্তি প্রদান করিবেন।"*

* "Victoria, by the Grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and of the Colonies and Dependencies thereof in Europe, Asia, Africa, America, and Australasia, Queen, Defender of the faith.

"Whereas, for divers weighty reasons, we have resolved, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons in Parliament assembled, to take upon ourselves the Government of the territories in India, heretofore administered in trust for us by the Honourable East India Company:

ভারতবর্ষ মহারাজ্ঞীর খাসে আসিলে ইঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল। পূর্ব্বে যেরূপ বোর্ড অব কণ্ট্রোল এবং কোর্ট

"Now therefore, we do by these presents notify and declare that, by the advice and consent aforesaid, we have taken upon ourselves the said government, and we hereby call upon all our subjects within the said territories to be faithful and to bear true allegiance to us, our heirs and successors, and to submit themselves to the authority of those whom we may hereafter from time to time see fit to appoint to administer the government of our said territories, in our name and on our behalf.

"And we, reposing especial trust and confidence in the loyalty, ability, and judgement, of our right trusty and well-beloved cousin and Councillor, Charles John Viscount Canning, do hereby constitute and appoint him, the said Viscount Canning, to be our First Viceroy and Governor-General in and over our said territories and to adminster the government thereof in our name, and generally to act in our name and on our behalf, subject to such orders and regulations as he shall, from time to time, receive from us through one of our principal Secretaries of State.

"And we do hereby confirm in their several offices, civil and military, all persons now employed in the service of the honourable East India Company, subject to our future pleasure, and to such laws and regulations as may hereafter be enacted.

"We hereby announce to the native princes of India that all treaties and engagements made with them by or under the authority of the Honourable East India Company are by us accepted, and will be scrupulously maintained; and we look for the like observance on their part.

"We desire no extension of our present territorial possessions, and, while we will permit no aggressions upon our dominions or our rights to be attempted with impunity, we shall sanction no encroachment on those of others. We shall respect the rights, dignity, and honour of native princes as our own, and we desire that they, as well as our own subjects, should enjoy that prosperity and that social advancement which can only be secured by internal peace and good government.

"We hold ourselves bound to the natives of our Indian territories by the same obligations of duty which bind us to all our other subjects; and those obligations, by the blessing of Almighty God, we shall faithfully and conscientiously fulfil.

"Firmly relying ourselves on the truth of Christianity, and acknowledging with gratitude the solace of religion, we disclaim alike the right and the desire to impose our convictions on any of our subjects. We declare it to be our Royal will and pleasure that none be in anywise favoured, none molested or disquieted, by reason of their religious faith or observances, but that all shall alike enjoy the equal and impartial protection of the law; and we do strictly charge and

অব ডিরেক্টর ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে একজন মন্ত্রী সেক্রেটারি অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক ভারতবর্ষের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত

---

enjoin all those who may be in authority under us that they abstain from all interference with the religious belief or worship of any of our subjects, on pain of our highest displeasure.

"And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to offices in our service, the duties of which they may be qualified, by their education, ability, and integrity, duly to discharge.

"We know and respect the feelings of attachment with which the natives of India regard the lands inherited by them from their ancestors and we desire to protect them in all rights connected therewith, subject to the equitable demands of the State ; and we will that, generally, in framing and administering the law, due regard be paid to the ancient rights, usages, and customs of India.

"We deeply lament the evils and misery which have been brought upon India by the acts of ambitious men, who have deceived their countrymen by false reports, and let them into open rebellion. Our power has been shown by the suppression of that rebellion in the field ; we desire to show our mercy by pardoning the offences of those who have been thus misled, but who desire to return to the path of duty.

"Already in one province, with a view to stop the further effusion of blood, and to hasten the pacification of our Indian dominions, our Viceroy and Governor-General has held out the expectation of pardon, on certain terms, to the great majority of those who, in the late unhappy disturbances, have been guilty of offences against our Government, and has declared the punishment which all be inflicted on those whose crimes place them beyond the reach of forgiveness. We approve and confirm the said act of our Viceroy and Governor-General, and do further announce and proclaim as follows :—

"Our clemency will be extended to all offenders, save and except those who have been or shall be convicted of having directly taken part in the murder of British subjects.

"With regard to such, the demands of justice forbid the exercise of mercy.

"To those who have willingly given asylum to murderers, knowing them to be such, or who may have acted as leaders or instigators in revolt, their lives alone can be guaranteed ; but, in appointing the penalty due to such persons, full consideration will be given to the circumstances under which they have been induced to throw off their allegiance, and large indulgence will be shown to those whose crimes may appear to have originated in a too-credulous acceptance of the false reports circulated by designing men.

"To all others in arms against the Government we hereby promise unconditional pardon, amnesty and oblivion of all offences against ourselves, our crown and dignity, on their return to their homes and peaceful pursuits,

হইলেন এবং তাঁহার পরামর্শীস্বরূপ বার জন কৌন্সিলর বা মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। লর্ড ষ্টান্লী সাহেব ভারতবর্ষের প্রথম ষ্টেট সেক্রেটরী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল এবং অনেকানেক স্থলে রাজস্ব আদায়ের যে সমূহ বিঘ্ন হইয়া গিয়াছিল তজ্জন্য রাজ্যের ঋণ প্রায় ৩০ কোটি টাকা বৰ্দ্ধিত হয়। সৈনিক ব্যয়ও বার্ষিক প্রায় ৫ কোটি টাকা বাড়ে। ফল কথা রাজ্যের আয় অপেক্ষা ব্যয় প্রায় প্রতি মাসে এক কোটি টাকা অধিক হয়। আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা হইতে থাকে। দেশীয় সৈনিক সংখ্যা কমাইয়া ব্যয় লাঘবের চেষ্টা হয়, সিবিলিয়ানদিগের বেতন কিছু কিছু ন্যূন করিবারও প্রস্তাব হয়, পবলিক্ ওয়ার্কের কার্য্য একেবারে স্থগিত হইয়া থাকে এবং নূতন নূতন করাদানের নিমিত্তও চেষ্টা আরম্ভ হয়। বিদেশীয় আমদানীর প্রতি মাসুল বৃদ্ধি করা হয়। এখানকার চাউল প্রভৃতি রপ্তানির উপরেও মাসুল বাড়ে। ষ্ট্যাম্পের দাম বাড়ান হয়। সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যের উপরেও কর নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হয়। এদিকে বিদ্রোহানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হয় নাই। অযোধ্যার উত্তর ভাগে নানা সাহেব এবং অযোধ্যার বেগম, মধ্য ভারতবর্ষে তাঁতিয়া তোপী, এবং স্থানে স্থানে বিদ্রোহী সিপাহীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহাদিগের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল এবং

"It is our Royal pleasure that these terms of grace and amnesty should be extended to all those who comply with their conditions before the first day of January next.

"When by the blessing of Providence, internal tranquility shall be restored, it is our earnest desire to stimulate the peaceful industry of India, to promote works of public utility and improvement, and to administer its Government for the benefit of all our subjects resident therein. In their prosperity will be our strength, in their contentment our security, and in their gratitude our best reward. And may the God of all power grant unto us, and to those in authority under us, strength to carry out these our wishes for the good of our people."

তজ্জন্যও ব্যয়ের আধিক্য হইতেছিল। চমৎকারের বিষয় এই যে,এই সময়ে দেশীয় সৈনিকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ৫৭ অব্দে ইউ-রোপীয় সৈনিক ৪৫ হাজার এবং দেশীয় সৈনিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার ছিল। ৫৯ অব্দে ইউরোপীয় ৯০ হাজারের অধিক এবং দেশীয় ২ লক্ষ ৪০ হাজা-রের অধিক হয়। অথচ ৬০ সহস্রের অধিক সিপাহী বিদ্রোহে বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতএব দেশীয় সৈনিক যেমন এক পক্ষে ৬০ হাজার কমে,তেমনি পক্ষান্তরে ৭০ হাজার বাড়িয়াছিল। ভারত-সাম্রাজ্যের এরূপ বিশৃঙ্খলতা ইংরাজদিগের আমলের মধ্যে আর কখন হয় নাই।

ইংলণ্ডে অনেকেরই মত হইতে লাগিল যে রাজ্যের বিস্তার সঙ্কুচিত করিয়া আনা নিতান্ত আবশ্যক! কোন কোন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষও বলিলেন যে, ভারতবর্ষের অধিকার ইংলণ্ডের দৌর্ব্বল্যের হেতু, অতএব ঐ রাজ্য একেবারে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। পার্লিয়ামেণ্ট ভারত-বর্ষের ঋণদায়ে ইংলণ্ডকে দায়ী করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং ইংলণ্ডেও আর অল্প সুদে টাকা ধার পাওয়া যাইতে লাগিল না। আর এখানেও টাকা পাওয়া নিতান্ত কঠিন হইয়াই উঠিল। ৫৬ অব্দে যে ৪॥০ টাকা সুদের কাগজ খোলা হইয়াছিল তাহা বন্ধ করিয়া ৫৭ অব্দে ৫ টাকার কাগজ খোলা হয়। অনন্তর ৫॥০ টাকার খোলা হইয়াছিল। ঐ কাগজেরও অৰ্দ্ধেক ৫ টাকার কাগজে এবং অৰ্দ্ধেক নগদে লইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি টাকা পাওয়া যাইতেছিল না। গবর্ণমেণ্ট ঐ সময়ে বার্ষিক হুণ্ডি বাহির করিলেন, তাহাও লোকে লইল না।

পতিত ভূমি বিক্রয়ের প্রস্তাব হইল। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারী কুড়ি সনের খাজনায় বিক্রীত করিয়া একেবারে নিষ্কর করিয়া দিবার কথার উত্থাপন হইল। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না।

রাজ্যের এই অবস্থায় হালিডে সাহেব, বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যান। হালিডে সাহেব যে একজন অতি বিচক্ষণ কার্য্যদক্ষ এবং তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি

ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তিনি পুলিস, ডাকাইত, সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল বিজ্ঞাপনী প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু হালিডে সাহেব প্রজা-রঞ্জনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এতদ্দেশীয়গণের স্বজাতিবিদ্বেষ সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দেন তজ্জন্য এখানকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন এদেশীয় দিগের প্রতি তাঁহার তাদৃশ শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাসের কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই। তিনি শেষাবস্থায় নীলকর সাহেবদিগের প্রতি অধিকতর প্রীতি এবং বিশ্বাস খ্যাপন করাতে প্রজাবর্গের অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাস্তবিক সিপাহী বিদ্রোহের সমকালে ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের ঐ প্রকার স্বজাতি পক্ষপাতিতা প্রকাশিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লর্ড কানিঙ—স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট।

(১৮৫৯—৬২)

হালিডে সাহেবের গমনের পর গ্রাণ্ট সাহেব বাঙ্গালার লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইলেন। গ্রাণ্ট সাহেব বাঙ্গালার সিবিলিয়ানবর্গের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সুদূরদর্শিতা এবং দৃঢ়তা যেরূপ, আড়ম্বর পরিশূন্যতা এবং প্রকৃত কার্য্যে অধ্যবসায়শীলতা তেমনি প্রশংসনীয়। তাঁহার সময়ে প্রথমতঃ মাজিষ্ট্রেট এবং কালেক্টরের পদ একীভূত হইয়া গেল। যিনি মেজেষ্টর তিনিই কালেক্টর হইলেন। এই প্রণালী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল এবং চতুর্দ্দিক হইতে ইহার প্রশংসাধ্বনি হইতেছিল। অতএব ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে গ্রাণ্ট সাহেব বাঙ্গালার মধ্যেও ঐ প্রণালী প্রচলিত করিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহা ভাল মনে করিতেন না। গ্রাণ্ট সাহেব আর একটী কাজ স্ব-ইচ্ছাতঃ করেন। ফেরি ফণ্ডের এবং টোল ফণ্ডের টাকা অন্যূন ৫ লক্ষ জমা হইয়াছিল তাহা খরচ করিয়া অন্যূন ১৩-টী নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া রেইলওয়ের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। আবকারির ব্যবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষায় ভাল করা হইল। দেশীমদ্য সরকারী ভাটিতে ভিন্ন অপর কোথাও প্রস্তুত হইতে পাইবে না এই নিয়ম হইল।

এই সময়ে (১৮৬০ অব্দে) সাম্রাজ্যের সম্বন্ধেও কয়েকটী অতি ব্যাপক নিয়ম প্রচলিত হইয়া গেল। রাজ্যের আয় ব্যয় সমঞ্জসীকৃত করিবার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ অর্থশাস্ত্রবেত্তা উইলসন সাহেব ভারতবর্ষে কোষাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি প্রথমে একবার সমুদায় দেশটী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। অনন্তর রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে প্রমাণ হইল যে, ১৮৫৯-অব্দে ব্যয় আয় অপেক্ষা

৯৷৷০ কোটি টাকা অধিক হইয়াছে এবং ১/৬০ অব্দে ৬৷৷০ কোটি টাকা হইবে। অতএব ৫ বৎসরের নিমিত্ত আয়-কর ব্যবস্থাপিত হইল। বার্ষিক ৫০০ টাকার অধিক আয়বান লোকদিগকে শতকরা ৪-টাকার হিসাবে এবং ২০০ টাকার অধিক ও ৫০০ টাকার ন্যূন আয়বান ব্যক্তিদিগকে শতকরা ২ টাকা হিসাবে কর দিতে হইবে এই নিয়ম হইল। * আমদানির উপর শতকরা দশ টাকার হিসাবে শুল্ক অবধারিত হইল এবং রপ্তানির মধ্যে সোরার উপর ঐ পরিমাণে শুল্ক গৃহীত হইতে আরম্ভ হইল।

এই সময়ে ষ্টেট সেক্রেটারী স্যর চার্লস উড্ সাহেব টিপু সুলতানের বংশীয়দিগকে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিলেন। তাহা করাতে এখানকার ইংরাজ বাঙ্গালী সকলেই মহা ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন, এবং ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্যেরা ঐ অযথাদানের প্রয়োজন জানিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনেরলের স্থানে তদ্বিষয়ক কাগজ পত্র দেখিতে চাহিলেন। ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট সভার সভ্যেরা স্বদেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখানকার ব্যবস্থাপক সমাজের কর্তৃত্ব তেমন নহে। সুতরাং কাগজ পত্র তাঁহাদিগকে দেখিতে দেওয়া হইল না।

দেশীয় মহাশয়েরা এই সময়ে স্বাধীন ইউরোপীয়দিগের সহিত যোগ দিয়া স্যর চার্লস্ উড্ সাহেবের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিলেন, আবেদনের ফল কিছুই হয় নাই।

কিন্তু ঐ আবেদন করিবার নিমিত্ত যে আন্দোলন হয়, তাহা অপেক্ষা একটী অতি গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন বাঙ্গালার মধ্যে চলিতেছিল। তাহার স্থূল স্থূল বিবরণ এই। যশোহর, নবদ্বীপ, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েকটী জিলায় বহুপূর্ব্বাবধি নীলের চাস হইয়া আসিতেছিল। ঐ চাস ইউরোপীয়দিগের কর্তৃত্বাধীনে নির্ব্বাহিত হইত। নীলকর সাহেবদিগের

---

* এরূপ আয়করের তালিকায়—যাহাতে কেহই বাদ ছিল না—দেশের আর্থিক অবস্থা বড় সুস্পষ্ট হয়। সামাজিক প্রবন্ধের ২য় সংস্করণ ২৪৮ পৃষ্ঠায় ইহার তালিকা প্রকাশিত আছে।—প্রকাশক।

চাসের প্রণালী দ্বিবিধ—একটা নিজ, অপর রাইয়তি। নিজ চাস সাহেব-দিগের নিজ ভূমিতে বুনা কুলীদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত—কিন্তু ঐ চাসের পরিমাণ অতি অল্প মাত্র। অধিক নীল চাস রাইয়তদিগের ভূমিতে রাইয়তদিগের দ্বারাই হইত। রাইয়তেরা সাহেবদিগের স্থানে টাকা এবং বীজ দাদন লইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিতে নীল প্রস্তুত করিয়া দিবে স্বীকার করিত। অনন্তর নীল প্রস্তুত হইলে চারা কাটিয়া কুঠীতে লইয়া যাইত। কুঠীতে সচরাচর আট বাণ্ডিল নীল চারার দাম এক টাকা ধরা হইত, এবং ষ্টাম্পের দাম ও বীজের দাম এবং চারা আনিবার খরচা বাদ দিয়া নীলের দাম যত হইত, তাহা দাদনের টাকা হইতে বাদ দেওয়া যাইত। এইরূপ করাতে রাইয়তদিগের দাদন শোধ যাইত না এবং বর্ষে বর্ষে তাহাদিগের দেনা বৃদ্ধি হইয়া পরিশেষে তাহারা কুঠীর গোলাম হইয়া পড়িত।

এ প্রণালীতে যে এতদিন কাজ চলিয়াছিল, তাহার দুইটী কারণ। এক কারণ এই, অজ্ঞ রাইয়তেরা মনে করিত যে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, তাহারা আপনাদিগের ক্ষতি* স্বীকার করিয়াও কুঠিয়াল সাহেবদিগের নীলের চাস করিয়া দেয়। আর একটী কারণ, এতদিন খাদ্য দ্রব্যাদির অতিশয় সুলভ মূল্য ছিল তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্লেশে প্রজাদিগের একপ্রকার গুজরাণ হইত। সম্প্রতি নীল চাস স্থায়ী থাকিবার ঐ দুইটী কারণই গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারী নীল চাসের সম্বন্ধে প্রজাদিগের ভ্রম আছে জানিতে পারিয়া প্রকাশ্য কাছারিতে এবং মফঃস্বল ভ্রমণকালে তাহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন যে, নীল চাসে গবর্ণমেণ্টের কোন সম্পর্কই নাই। প্রজাদিগের ইচ্ছা হয় ঐ চাস করিবে, না হয় না

* ঠিক যে সময়ে আশু ধান্য পরিপক হয় সেই সময়েই নীলের চারা কাটা ও কুঠিতে বহন করা প্রভৃতির প্রয়োজন। সুতরাং নিজেদের পাকা ধানের ক্ষতি করিয়াই প্রথম কুঠিয়ালদের কার্য্য আগে করিতে হয়। এই নৈসর্গিক কারণের অসুবিধা ভিন্ন আমীনের মাপে আমলাদিগের হিসাবে এবং পিয়াদাদিগের "রোজে" অনেক অত্যাচার ছিল।

করিবে।* আর খাদ্য সামগ্রীর মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেরূপ চাউল ১৮৪০ অব্দে এক টাকা মণ তাহা এক্ষণে দুই টাকা। দাইল ১৸৴০ মণ হইতে ২৷৴০, তামাক ২৷০ টাকা হইতে ৫ টাকা, তৈল ৪৷৷৵০ হইতে ১৬ টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বে নীল দাদনের টাকা লইলে রাইয়তের সংসার চলিবার পক্ষে যত দূর সুবিধা হইত, এক্ষণে আর ততদূর সুবিধা হইত না। তদ্ভিন্ন, কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে নীল চাসের অপেক্ষা অপরাপর চাসের লাভ অধিক, ইহাও রাইয়তদিগের চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল কারণ মিলিত হওয়াতে রাইয়তদিগের মধ্যে নীলচাসের প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষ জন্মিয়া গেল। তাহারা নীলের দাদন লইতে অস্বীকৃত হইল এবং যাহারা পূর্ব্বে দাদন লইয়াছিল, তাহারাও নীল চাস করিয়া দিতে চাহিল না।

গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিলেন (১) যে রাইয়ত দাদন লইয়া নীলের চাস না করিবে, তাহাকে দাদনের পাঁচগুণ জরিমানা দিতে হইবে এবং কয়েদ খাটিতে হইবে। এ বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমের উপর কোন আপীল চলিবে না। রাইয়তেরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল। যে যে জিলায় নীলের চাস হইত, সমুদায়ের জেল রাইয়তে পূর্ণ হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট নীল চাসের দোষ গুণ বিচার করিবার নিমিত্ত একটী কমিসন নিযুক্ত করিলেন। কমিসন কিছু দিন কলিকাতায় কিছু দিন কৃষ্ণনগরে বসিয়া অনেকানেক নীলকর, জজ, মাজিষ্ট্রেট, মিসনরী সাহেব এবং দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। এবং পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলেন। নীল চাসের সমস্ত দোষ প্রকাশিত হইয়া গেল। নীলকর সাহেবদিগেরও আর ক্রোধের পরিসীমা রহিল না।

---

* আশলি ইডেন সাহেব (পরে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর) বারাসতের মাজিষ্ট্রেট থাকা কালে এইরূপ ব্যবহার করায় নীলকরেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি করেন। কমিসনর সাহেবও তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন।

তাঁহারা গবর্ণর জেনেরেলের নিকট গ্রাণ্ট সাহেবের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলেন। নীল চাসের প্রতি দেশীয় লোকের অভিমতি কিরূপ, ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত রায় দিনবন্ধু মিত্র প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করা হইয়াছিল। সেই অনুবাদক বিশুদ্ধচেতা পাদ্রি লঙ্ সাহেবের নামে সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে কারাবাস দেওয়া হইল। পরিশেষে গ্রাণ্ট সাহেবের নামেও সুপ্রীমকোর্টে নালিস করিয়া তাঁহার জরিমাণা করান হইল।

ফল কথা, এই সময়টীতে বাঙ্গালার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ অতি গুরুতররূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এক পক্ষে দেশীয় জনগণ এবং বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট, পক্ষান্তরে নীলকর প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধিকারী দল। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টও এই সময়ে একটু শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। চুক্তিভঙ্গের আইন এই সময়ে প্রস্তাবিত হইয়াছিল। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন মজুরদার অমুক কার্য্য করিয়া দিব বলিয়া যদি আগাম টাকা লয়, তবে দেওয়ানি-আদালতে তাহার মোকদ্দমা না হইয়া ফৌজদারী আদালতে সরাসরি বিচার হইবে এবং মজুরদারকে যেরূপে হউক ঐ চুক্তি বজায় করিয়া দিতে হইবে। এরূপ আইন অতি ভয়ানক। প্রাচীন রোমীয়দিগের মধ্যে এইরূপ আইন প্রচলিত ছিল বলিয়া তথায় সমূহ অত্যাচার হইয়াছিল—এরূপ আইনের প্রভাবেই অধমর্ণেরা উত্তমর্ণদিগের একান্ত বশীভূত দাস হইয়া পড়ে। কিন্তু স্যর চার্লস্ উড্ সাহেব ঐ আইন প্রচলিত হইতে দিলেন না।

কিন্তু ইহাতেও শ্রীবৃদ্ধিকারী এবং তৎপক্ষীয় রাজপুরুষদিগের নিবৃত্তি হইল না। বিনা আপীলে সরাসরি বিচার নিষ্পত্তি করাইবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ছোট আদালত সকল সংস্থাপিত করিবার বিধি নির্দ্ধারিত হইল। গ্রাণ্ট সাহেব যদিও তাড়াতাড়ি কতকগুলি ছোট আদালত বাঙ্গালায় স্থাপিত করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন না, তথাপি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞা পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিতে হইল। এই সকল আদালতের বলে নীলবিদ্রোহকারী প্রজাগণ ক্রমেই বশীভূত হইয়া

আসিতে লাগিল। তথাপি গ্রাণ্ট সাহেব ঐ আদালতের সংখ্যা যথাসাধ্য ন্যূন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নীলকর সাহেবেরাও বাস্তবিক কেহ সধন পুরুষ ছিলেন না। বাঙ্গালার মধ্যে তাঁহাদিগের যে সমস্ত কুঠী ছিল, তাহা প্রায় সকলই বন্ধকী। সুতরাং প্রজার সহিত সর্ব্বদা এরূপ হাঙ্গামায় লোকসান সহিয়া উহারা আর কতদিন টিকিবে—প্রায় সকলগুলিই দেউলিয়া হইয়া উঠিয়া গেল। আর যে যে কুঠী রহিল, তাহাতে নীল চারার দর বৃদ্ধি করিয়া দিয়া যাহাতে রাইয়তদিগের নিতান্ত ক্ষতি না হয় এরূপ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইল।

কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিকারী দল নীলে হতাশ হইয়া আর একদিকে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আসাম কাছাড় দার্জিলিঙ প্রভৃতি পার্ব্বতীয় ভূমিতে চায়ের চাস করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অগ্রসর হইলেন এবং ১৮৯৫ অব্দে লর্ড ষ্টান্‌লী সাহেব পতিত ভূমি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত যে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন তদনুযায়ী নিয়ম করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কানিঙ্‌ বাহাদুর ঐ বিষয়ে কয়েকটী নিয়ম করিয়া দিলেন। কিন্তু পতিত ভূমি বড় অধিক পরিমাণে ক্রীত হইল না।

আরও কয়েকটী প্রধান প্রধান ব্যবস্থা এই সময়ে প্রচলিত হইয়া গেল। পূর্ব্বে বাঙ্গাল বেঙ্ক প্রভৃতির বেঙ্কের নোট চলিত। এখন অবধি তাহা রহিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের 'কুরেন্‌সি' নোট প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইল। ঐ নোট গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং চালাইলেন না। বাঙ্গাল বেঙ্কের দ্বারাই চালাইলেন। নোট চালাইবার বিষয়ে ব্যবস্থা এই হইল যে, যত টাকার নোট বাহির হইবে তাহার বার আনা পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের কাগজ খরিদ হইয়া জমা থাকিবে। আর সিকি পরিমাণ নগদ টাকা মজুত থাকিবে। এইরূপ করাতে প্রথম বর্ষেই প্রায় দুই কোটি টাকার কাগজ খরিদ হইয়া গেল। সুতরাং ঐ কাগজের উপর গবর্ণমেণ্টের যে সুদ লাগিতেছিল তাহা আর দিতে হইল না। প্রথম কোষাধ্যক্ষ উইলসন্‌ সাহেবই এইরূপ করেন্‌সি নোট প্রচলিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তবে তিনি সমুদায় সাম্রাজ্যটিকে নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত

করিয়া একবিভাগের নোট অন্য বিভাগে চলিবে না এরূপ ব্যবস্থা করিতে চাহেন, আর নোট বিক্রীত হইয়া যত টাকা হইবে তৎসমুদায়ই কোম্পানির কাগজে এবং নগদে মজুদ রাখিতে বলেন নাই। স্যর চার্লস উড্ সাহেব সেই জন্য তৎকৃত প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এক্ষণে দ্বিতীয় কোষাধ্যক্ষ লেইঙ্ সাহেব যে ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে সম্মতি হইল এবং করেন্সি নোট চলিয়া গেল।

লেইঙ্ সাহেব আর একটী বিষয়েও কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সৈনিক সংখ্যা না কমাইলে রাজ্যের আয় ব্যয়ে সামঞ্জস্য হয় না। অতএব সৈনিক সংখ্যা ন্যূন করা হইল। কতক ইউরোপীয় সৈন্য ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল। আর অনেক দেশীয় সৈন্য পুলিসের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। যে সাংগ্রামিক সৈনিকবর্গ রহিল, তাহারাও ইংলণ্ডীয় সৈন্যের সহিত একীভূত হইয়া গেল। এই একীকরণ ব্যবস্থা প্রথম প্রবৃত্ত হইলে কোম্পানির সৈনিকবর্গ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল আমরা কোম্পানির চাকুরি করিব বলিয়াই শপথ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া একেবারে মহারাজ্ঞীর সৈনিকশ্রেণী সন্নিবিষ্ট করায় গবর্ণমেণ্টের অধিকার নাই। কথা সত্য। অতএব তাহাদিগকে চাকুরি ছাঁড়িয়া দিবার অনুমতি প্রদান হইল। কিন্তু কার্য্যকালে অধিক লোক ঐ অনুমতির ফল গ্রহণ করিল না। প্রায় সকলেই আবার শপথ গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ্ঞীর সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইল।

এইরূপে বিবিধ উপায় দ্বারা রাজ্যের আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় লাঘব করিয়া লেইঙ্ সাহেব দেখাইলেন যে ৬০।৬১ অব্দে গবর্ণমেণ্টের আয় ৪১ কোটি এবং ব্যয়ও প্রায় ঐ পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সর্ব্বশুদ্ধ ২০ লক্ষ টাকার অনাটন আছে। কলিকাতার বাণিজ্যের অবস্থাও এই সময়ে মন্দ ছিল না। আমদানি ৬৫ কোটির অধিক এবং রপ্তানিও সেই পরিমাণ হইয়াছিল। সোরা, চিনি, রেসম এবং চটের রপ্তানিই বিশিষ্টরূপ হইয়াছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যের সকল ভাগে এরূপ সুবিধা ছিল না। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন অতি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষ-

বিষয়ক অনুসন্ধানে প্রকাশ হয় যে ৩৭।৩৮ অব্দের দুর্ভিক্ষে যে প্রকার মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল এবারে সেরূপ হইতে পায় নাই। তাহা না হইবার কারণ শুদ্ধ রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ১৮১২ অব্দে ইংরাজদিগের অধিকার সম্ভুক্ত হয় এবং সেই সময়েই রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইবে বলিয়া অভিমতি প্রকাশ হয়। অনন্তর ১৮২২ অব্দে সমুদায় ভূমির জরিপ করিয়া প্রজাদিগের স্বত্ব নিরূপণ পূর্ব্বক রেজিষ্টরি প্রস্তুত হয়। পরে ৩৩ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করিয়া সাময়িক বন্দোবস্তের প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা হয়। ঐ সাময়িক বন্দোবস্তের ফল বিশিষ্টরূপে না ফলিতে ফলিতেই ৩৭।৩৮ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে শতকরা ৪০ জন মারা পড়ে। এক্ষণে শতকরা ১৯ জনের বেশী মারা পড়ে নাই। অতএব কর্ত্তৃপক্ষীয়ের স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে যত অধিক দিনের নিমিত্ত রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যায় প্রজাগণ ততই সবল হইয়া থাকিতে পারে এবং দুর্ভিক্ষ পীড়ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অতএব উত্তরপশ্চিম প্রদেশেও বাঙ্গালার ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করা বিধেয়।

বাঙ্গালার সহিত অপরাপর প্রদেশের তুলনা করিয়াও বোধ হইয়াছিল যে রাজস্বের সাময়িক বন্দোবস্ত অপেক্ষায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই ভাল। বাঙ্গালার ভূমির রাজস্ব ৩৷৷০ কোটির কিছু অধিক মাত্র কিন্তু সমুদায় রাজস্ব ১৪ কোটিরও অধিক, অতএব এখানকার ভূমি-কর অপেক্ষা অন্যান্য কর প্রায় পাঁচগুণ, কিন্তু ভারতবর্ষের অপরাপর সমস্ত প্রদেশে ভূমির করই প্রধান কর। ইহাতেও কর্ত্তৃপক্ষীয়ের অনুমান হইল যে ভূমির রাজস্ব চিরস্থায়ী করিয়া দিলে প্রজাদিগের নিতান্ত দৈন্যাবস্থা দূরীভূত হইয়া তাহারা অন্যান্য কর দানে সমর্থ হইতে পারে।

ফল কথা, এই সময়ে গবর্ণমেণ্টের অভিমতি এরূপ হইল যে, দেশীয় লোকদিগের মধ্যে কতকগুলি সধন এবং প্রভুত্বশালী থাকিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল লোকের দ্বারা রাজ্যের আভ্যন্তরিক শাসন নির্ব্বাহিত করেন। অন্যান্য প্রদেশে এবং কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গালার মধ্যেও অনরেরী

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়োগ হইল। মহারাজ্ঞীও এই সময়ে "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" নামক একটী কুলীন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর সেই সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান এবং কয়েকজন প্রধান প্রধান ইউ-রোপীয় কর্ম্মচারী এবং দেশীয় রাজা ও রাজমন্ত্রী ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন। এই "ভারত-নক্ষত্র" উপাধির চিহ্ন একটী স্বর্ণপদক। সেই পদকের মধ্যভাগে হীরকমণ্ডিত তারকাকার মহারাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি--এবং তদূর্দ্ধভাগে ইংরাজী ভাষায় লিখিত এই কথা—"দিব্যালোক আমাদিগের পথ দর্শক।"

কিন্তু শুদ্ধ এই পর্য্যন্তই হইল না। দেশীয় লোকদিগের অভিমতি গ্রহণ পূর্ব্বক যে এখানকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত তাহা কার্য্যতঃও কতক স্বীকৃত হইল। ১৮৫৩।৫৪ অব্দে যে ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইয়া-ছিল তাহা উঠিয়া গেল এবং নূতন ব্যবস্থাপক সমাজের সৃষ্টি হইল। এই নূতন নিয়মানুসারে গবর্ণর জেনেরেলের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার কার্য্যসচিবগণ ভিন্ন অপর দ্বাদশ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন স্থির হইল এবং ঐ বারজনের মধ্যে অর্দ্ধেক সভ্য রাজকার্য্য-সম্পর্ক-শূন্য হইবেন ইহাও নিরূপিত হইল। পটিয়ালার মহারাজা, সিন্ধিয়ার মন্ত্রী দিনকর রাও, নিজামের মন্ত্রী সালারজঙ্গ এবং বারাণসীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ এই কয়েক জন দেশীয় লোক প্রথম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নিমিত্ত যে বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও এই সময়ে বিশিষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়া বাঙ্গালা, বোম্বাই এবং মান্দ্রাজ, এই তিন প্রদেশের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপক সমাজ নিযুক্ত হইল। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সমাজে এদেশীয় দুই জন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু পূর্ব্বকার ব্যবস্থাপক সমাজ যে প্রকারে ইংলণ্ডীয় পালিয়ামেণ্টের অনুকরণ প্রবৃত্ত হইয়া রাজকীয় কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে এই নিয়ম হইল যে, কোন্ কোন্ বিষয়ের বিচার হইবে তাহা অবধারিত করায় সভাপতি ভিন্ন অপর কোন সভ্যের অধিকার থাকিবে না, রাজস্ব সম্পৃক্ত কোন ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি

সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে না আর যে যে ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি সভায় প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের কথা উত্থাপন করা যাইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন, ইহাও নিয়মিত হইল যে, সভা হইতে কোন ব্যবস্থা প্রচলিত করিবার অভিমতি হইয়া গেলেও উহা প্রথমে গবর্ণর বাহাদুরের তৎপরে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের অনুমতিসাপেক্ষ। আর ষ্টেট্ সেক্রেটারী গবর্ণর জেনেরেলের অভিমত ব্যবস্থাতেও অসম্মতি খ্যাপন করিলে তাহা প্রচলিত হইতে পারিবে না।

এই সকল নিয়ম দেখিলেই বোধ হয় যে তখনকার ব্যবস্থাপক সভার হস্তে প্রকৃত রাজশক্তি কিছুই দেওয়া হয় নাই। তবে বিদেশীয় রাজা পাছে ভ্রমক্রমে দেশীয় জনগণের নিতান্ত বিরক্তিকর কোন ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া ফেলেন তাহারই প্রতিবিধানের কতক উপায় হইয়াছিল মাত্র এবং দেশীয়েরাও স্বজাতীয় দুই চারিজন লোককে ব্যবস্থাপক সভার উচ্চ আসনে অধিরূঢ় দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিলেও থাকিতে পারেন, এই মাত্র। ফলতঃ যতদিন দেশীয় জন সমূহের মধ্যে রাজকার্য্য বিষয়ক অনুসন্ধান বর্দ্ধিত না হইবে, যতদিন তাঁহারা তদ্বিষয়ক মতামতের পরীক্ষা করিতে না শিখিবেন, এবং আমাদের অমুক বা অমুক এসকল বিষয়ে যাহা যাহা বলিতেছেন তাহাই আমাদিগের সকলের মনোমত কথা এরূপ বলিয়া আপনাদিগের বিচারশক্তির এবং "ঐকমত্যের" প্রমাণ দেখাইতে না পারিবেন, ততদিন প্রকৃত প্রস্তাবে দেশীয় লোকের অভিমতানুযায়ী হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসাধ্যপ্রায় হইয়াই থাকিবে।

যাহা হউক, কানিঙ্ বাহাদুরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, তথা দেশীয় প্রধান লোকদিগের পক্ষপাতী মনে করিয়া তাঁহার প্রথম ব্যবস্থাপক সভায় একটী গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিষয়টী এই।— এদেশে পৈত্রিক সম্পত্তির সম বিভাগের নিয়ম প্রচলিত থাকায় বড় বড় ঘর প্রায়ই অধিক দিন টিকে না। একজন বড় মানুষ হইয়া কোটি টাকার সম্পত্তি করিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে চারি পাঁচটী পুত্রে ঐ সম্পত্তি সমান

করিয়া ভাগ করিয়া লইল। আবার তাহাদের পর তাহাদের বহু সংখ্যক পুত্রেরা পুনর্ব্বার পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাজিত করিল। সুতরাং দুই তিন পুরুষের মধ্যে আর একজনও বড় মানুষ রহিল না। অতএব কেহ কেহ মনে করিলেন যে, এখানে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত জায়গীর সকলের সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। পাতিয়ালার মহারাজ এই আইনের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু দিনকর রাও প্রভৃতি অনেকেই ইহার প্রতিকূলে মত দিলেন। আইন প্রচলিত হইল না।

বাঙ্গালার জমীদারেরা এবং অযোধ্যার কতকগুলি তালুকদারও এই বিষয়ে বিলক্ষণ সচেষ্ট হইয়া কানিঙ্ বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কথায় অনেক আন্দোলন হইলেও পরিণামে কোন ফল দর্শে নাই।

বাস্তবিক জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা যে দেশে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। ঐ ব্যবস্থা বোধ হয় কোন সময়ে পৃথিবীর সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। ক্রমে উহা উঠিয়া যায়। কিন্তু যেখান হইতে একবার উঠিয়া গিয়াছে সে দেশে আবার উহার প্রবর্ত্তন নিতান্ত অসঙ্গত এবং অসাধ্য।

যাহা হউক, ঐ সকল কথার প্রস্তাব এবং আন্দোলনেই বোধ হয় যে প্রজা সাধারণের অন্তঃকরণে আর কোন ভয় বা উদ্বেগ ছিল না—প্রত্যুত দূরদর্শী অতি মহতী আশারই সঞ্চার হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় সভ্যদিগের হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া ইংরাজেরা পরিহাস করিতেছিলেন না, অযোধ্যা প্রদেশে তালুকদার-মাজিষ্ট্রেটেরা যে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত করিতেছিলেন তাহার প্রতি তত্রত্য ধর্ম্মাধিকরণ সচিব কাম্বেল সাহেব এক প্রকার সন্তোষ প্রকাশ করিতেছিলেন। পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মণ্টগোমরি সাহেব তত্রত্য ভূম্যধিকারি-বিচারপতিবর্গের শতমুখে ধন্যবাদ করিতেছিলেন। বাঙ্গালায় নীলকরদিগের অধঃপতনে প্রজাগণ সন্তুষ্ট এবং জমীদারবর্গ উৎসাহশীল, রাজ্যের আয় ব্যয় সমশ্রসীভূত হওয়ায় আর নূতন কর সংস্থাপিত হইবার ভয় নাই—বাণিজ্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট

এবং ম্যাকনাদগের গৃহাবচ্ছেদ বশতঃ সেখানকার তুলার রপ্তান বন্ধ হওয়াতে ভারতবর্ষ হইতে তুলা লইবার চেষ্টায় ঐ বাণিজ্য বিশিষ্টরূপেই অভ্যুদয়োন্মুখ—এই অবস্থায়, ১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে কানিঙ্ বাহাদুর স্বদেশ যাত্রা করিলেন। বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেবও তাহার পর মাসেই গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

লর্ড এল্‌গিন্—স্যর সিসিল বীডন।

১৮৬২ অব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড এল্‌গিন্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইলেন। ডালহৌসি, কানিঙ এবং এল্‌গিন তিন জনেই সমাধ্যায়ী ছিলেন। এল্‌গিন্ সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের সময় একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ইংলণ্ড হইতে কতক সৈন্য লইয়া চীনীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থ গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে কানিঙ সাহেবের পত্র পাইয়া সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিবার নিমিত্ত কিছু সৈন্য দিয়া যান।

এল্‌গিন্ সাহেব যে সময়ে গবর্ণর জেনেরেল হইলেন, তৎকালে বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বীডন্ সাহেব, মান্দ্রাজে ডেনিসন্ সাহেব, বোম্বাই নগরে ফ্রীয়র সাহেব, পঞ্জাবে মণ্টগোমরি সাহেব, মধ্যপ্রদেশে টেম্পল্ সাহেব, অবোধ্যাতে ইউল্ সাহেব এবং ব্রহ্মদেশে ফেয়র সাহেব—এই কয়েক জন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব লেয়ইঙ্ সাহেবের বজেট্ হিসাব স্যর চার্ল্‌স্ উড্ সাহেব গ্রাহ্য করেন নাই। বাস্তবিক ঐ হিসাবে কয়েকটী ভুল ধরা পড়ে এবং লেয়ইঙ্ সাহেব বিলক্ষণ তিরস্কৃত হয়েন। তাঁহার পদে স্যর চার্ল্‌স্ ট্রেবিলিয়ান সাহেব রাজস্ব-সচিব হইয়া আসিলেন। পূর্ব্বে যখন মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন, তখন ইনিই উইল্‌সন্ সাহেবের ব্যবস্থাপিত

আয়করের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেই দোষে কর্ম্ম-চ্যুত হইয়াছিলেন। স্যর চার্লস্ উড্ সাহেব এক্ষণে ইহাঁকেই রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে সুপ্রীমকোর্ট এবং সদর দেওয়ানি আদালত ভাঙ্গিয়া দুইয়ে মিশাইয়া নূতন হাইকোর্ট সংস্থাপিত হইল। এই কোর্টে কতকগুলি প্রধান প্রধান সিবিলিয়ান বিচারপতি এবং কতকগুলি বারিষ্টর (ইংলণ্ডীয় উকীল সম্প্রদায়) বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁদিগের যিনি সর্ব্ব-প্রধান তাঁহার উপাধি চীফ্ জষ্টিস্ (প্রধান বিচারপতি) এবং তিনি এক জন বারিষ্টর হইবেন এই নিয়ম হইল। ঐ নিয়মানুসারে স্যর বার্ণেস পীকক সাহেব কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হইলেন। ১৭৭২ অব্দে যখন প্রথম সুপ্রীমকোর্ট সংস্থাপিত হয়, সেই অবধি এতদিন পর্য্যন্ত ঐ কোর্টের সহিত কোম্পানির গবর্ণমেণ্টের কখন অধিক কখন অল্প চির-কালই একপ্রকার বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে ভারত সাম্রাজ্য মহারাজ্ঞীর খাস হওয়াতে ঐ বিবাদের মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল এবং একটী সর্ব্বপ্রধান বিচারালয় সংস্থাপিত হইল।

ফল কথা, সিপাহী বিদ্রোহ ঘটনায় রাজ্যের যে যে নূতন বন্দোবস্ত করিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল, সেগুলি সমুদায় এতদিনে নিঃশেষিত হইল। আর কোন দিকে নূতন কিছু করিবার বাকী রহিল না। কিন্তু রাজকার্য্য বিষয়ক বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেলেও বৃহৎ বৃহৎ বৈদেশিক ব্যাপারের সংঘটনায় অনেক নূতন নূতন কাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এ সময়ের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা মার্কিনদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ। সেই বিচ্ছেদনিবন্ধন উহাদিগের দেশ হইতে ইংলণ্ডে যে তূলার আমদানি হইত, তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য কাপ-ড়ের। তূলার আমদানি বন্ধ হইয়া গেলে কাপড় প্রস্তুত করিবার পক্ষে সমূহ ব্যাঘাত জন্মিল। কাপড়ের কল আর চলিল না, এবং লাঙ্কাসায়ের প্রদেশের যে সকল লোকেরা কাপড়ের কলে খাটিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত, তাহারা অন্নাভাবে মারা পড়িবার উপক্রম হইতে লাগিল। ঐ

দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ এদেশে চাঁদা সংগ্রহ হইয়া সাত লক্ষ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু চাঁদার টাকায় কি হইবে? অতএব যাহাতে এদেশ হইতে তূলা যায়—তাহারই নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা হইতে লাগিল।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে কতক তূলা ইংলণ্ডে যাইত। তখন কোম্পানি নিজে দাদন করিয়া এদেশে তূলা সংগ্রহ করিতেন এবং ইংলণ্ডে পাঠাইতেন। অনন্তর ১৮৩০ অব্দে কোম্পানির বাণিজ্য কার্য্য রহিত হইয়া গেলে ঐ তূলার দাদন উঠিয়া যায়। কিন্তু কোম্পানির দাদন উঠিয়া গেলেও অপরাপর বণিকেরা এখান হইতে কতক তূলা পাঠাইতেন। পরিশেষে মার্কিন তূলার আমদানি যেমন হইল, ইংরাজ বণিকবর্গ আর এ দেশীয় তূলা ক্রয় করিলেন না। ভারতবর্ষীয় তূলা মাঞ্চেষ্টর নগরের বাজারে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল, এবং এখানকার বণিকবর্গ সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। বাণিজ্যটী এইরূপে নষ্ট হইয়াছিল। ঐক্ষণে সেই নষ্ট বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতে লাগিল।

ইউরোপীয়রাই নূতন কোন কার্য্যের প্রকৃতি অনুভব করিতে পারেন, এবং তাহার সাধনে উৎসাহশীল হইয়া থাকেন। এদেশের লোকেরা প্রায়ই কোন নূতন কার্য্যের প্রথমাবস্থা হইতে তাহার কিছুই জানিতে এবং বুঝিতে পারে না; সুতরাং উদাসীন ভাবেই থাকে। ইউরোপীয়রা বিবেচনা করেন যে, এদেশ হইতে কিছু উৎপন্ন করিতে হইলে এখানকার ভূমির উপর যে রাজস্ব অবধারিত আছে, তাহা উঠিয়া গিয়া ভূমিতে তাঁহাদিগের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব হওয়া আবশ্যক। আর কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্য যাহাতে দেশের ভিতর হইতে সমুদ্রোপকূলভাগে স্বচ্ছন্দে আনয়ন করিতে পারা যায়, এমত রাস্তা ঘাট থাকা আবশ্যক, এবং তৃতীয়তঃ, এদেশীয় শ্রমোপজীবী লোকদিগকে যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত রাখিয়া খাটাইয়া লইতে পারা যায়, এমত একটী ব্যবস্থার আবশ্যক। যতদিন ভারতবর্ষ কোম্পানির অধিকৃত স্থান ছিল, ততদিন শ্রীবৃদ্ধিকারী ইউরোপীয়দিগের তেমন অধিক প্রভাব প্রকাশিত হইতে পায় নাই। ভারতবর্ষ খাস হওয়াতে

ইংরাজ মাত্রেরই এখানে গতিবিধির আর কোন শঙ্কা রহিল না। বিশেষতঃ ইংলণ্ডীয় বণিকবর্গের যখন তুলার প্রয়োজন হইল, এবং সেই তুলা ভারতবর্ষ হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া স্থির হইল—তখন তুলার উৎপাদন এবং রপ্তানির সুবিধা করিবার নিমিত্ত যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের উপরে চাপ পড়িল।

কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়তাসহকারে ঐ চাপ সহ্য করিতে লাগিলেন, ভূমির রাজস্বও ছাড়িয়া দিলেন না, চুক্তিভঙ্গের কোন কঠিন দণ্ডও অবধারিত করিলেন না। তবে রেলওয়ে এবং অন্যান্য রাস্তা যাহাতে সত্বরে প্রস্তুত হইয়া উঠে তজ্জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্টের এবম্প্রকার দৃঢ়তার মূল স্যর চার্ল্স্ উড্ সাহেব। তিনিই ভূমি বিক্রয় সম্বন্ধে এবং চুক্তিভঙ্গের আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নিজ মত বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। কানিঙ বাহাদুরও তাহা পারেন নাই। তিনিও এখান হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের পক্ষে অনেক দূর গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

এল্গিন্ বাহাদুর স্যর চর্ল্স্ উড্ সাহেবের সকল কথা শুনিয়াই চলিতে লাগিলেন। তবে তাঁহার ব্যবস্থা-সচিব মেইন্ সাহেব চুক্তিভঙ্গের একটী আইন প্রস্তুত করিলেন, এবং তাহা লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় আন্দোলন হইতে লাগিল।

বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বীডন্ সাহেব দুই পক্ষ বজায় রাখিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনিই কানিঙ বাহাদুরের সময়ে প্রথমে চুক্তিভঙ্গের আইন প্রস্তুত করেন, তিনিই গ্রাণ্ট সাহেবের বিরুদ্ধপক্ষ হইয়া পরামর্শ দেন, তিনিই দেশময় ছোট আদালতের বিচার চালাইবার জন্য যত্নশীল হইয়াছিলেন। এইরূপে কানিঙ বাহাদুরের এবং শ্রীবৃদ্ধিকারীদলের মন রাখিয়া বীডন্ সাহেব স্বয়ং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলেন—তখন প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের আফিমের একচেটিয়া উঠাইয়া দেওয়া বিধেয় কি না, তদ্বিষয়ে কতক অনুসন্ধান করাইলেন। শ্রীবৃদ্ধিকারী অনেক ইংরাজের ইচ্ছা এই যে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং আফিমের চাসে কোন হাত না রাখেন;

কেবল রপ্তানির সময়ে শুল্ক গ্রহণ করিয়া আপনার রাজস্ব আদায় করিয়া লয়েন। এরূপ করিলে শ্রীবৃদ্ধিকারীরা আফিমের চাসে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন এবং যথেষ্ট লাভ করিবেন। বীডন্ সাহেব তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই হউক, আর যে জন্যই হউক, কিছু দিন ঐ কথার আন্দোলন করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি একবার আসাম প্রদেশে গমন করিয়া সেখানকার চায়ের চাসে যে কুলি মজুরের প্রয়োজন, তাহার উপায় করিয়া দিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। তদ্ভিন্ন বীডন সাহেবের আলিপুরের রাজভবনে কৃষি মেল্লার প্রদর্শন হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল—তাহাতেও প্রকাশ হইল যে তিনি এ দেশের কৃষিকার্য্যের ঔৎকর্ষ্যবিধানেই বিশেষ মনোযোগী।

বাঙ্গালী মহলেও বীডন্ সাহেবের সুসামাজিকতা এবং অমায়িক-ভাব তাঁহাকে বিলক্ষণ যশস্বী করিয়া তুলিল। তিনি শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের সমাদরকারী। তিনি শিক্ষাকার্য্যের পরম বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার যত্নে পাটনা নগরে একটী কলেজ সংস্থাপিত হইল, এবং অপরাপর কলেজগুলিতেও উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ও বাঙ্গালা পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইল।

বীডন্ সাহেব এখানকার সমাজ সংস্কারকদিগেরও অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং পুরুষদিগের বহুবিবাহ নিবারণ করিবার উদ্দেশে একটী আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে চেষ্টা হয়, তিনি তাহাতেও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে কাশীরাজ দেবনারায়ণ সিংহ ঐ ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিবেন, এইরূপ পরামর্শ হইয়াছিল। বীডন্ সাহেব এইরূপে সকল সম্প্রদায়ের নিকট বিশিষ্ট যশস্বী না হইলে তাঁহার সময়ে যে একটী গুরুতর অন্যায়াচরণের আজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহার নিন্দার পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু তাহা লইয়া কোন গোলযোগই হইল না।

১৮৫৯।৬০ অব্দে বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সংক্রামক জ্বর প্রথম দেখা যায়। ঐ জ্বর পীড়ায় শত শত, সহস্র সহস্র লোক নষ্ট হইয়া অনেক গ্রাম

জন-শূন্যপ্রায় হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট তাদৃশ মহামারীর কারণ অনুসন্ধানার্থ একজন ইংরাজ ডাক্তারকে নিযুক্ত করিলে তিনি এই বলিয়া রিপোর্ট করেন যে, দেশ মধ্যে বন জঙ্গল হওয়াতেই এইরূপ মহামারী উপস্থিত হইয়াছে। পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়ে পানা এবং অন্যান্য উদ্ভিদ জন্মিয়া পানীয় জল বিদূষিত করাও ঐ মহামারীর অন্যতর কারণ। বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টে ডাক্তার সাহেবের ঐ বিজ্ঞাপনীর উপর নির্ভর করিয়া বন জঙ্গল এবং পুষ্করিণ্যাদি পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এবং সেই অনুজ্ঞা পত্রে বলিয়া দিলেন, যে কেহ ঐ অনুজ্ঞানুযায়ী কার্য্য না করিবে তাহার বনাকীর্ণ ভূম্যাদি গবর্ণমেণ্ট স্বব্যয়ে পরিষ্কৃত করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। এমন অযথাভূত অনুজ্ঞা অবশ্য স্থায়ী হইবার নহে,উহা অবশ্য ভুল ক্রমেই প্রচারিত হইয়াছিল এবং অতি শীঘ্রই সংশোধিত হইল। ভূম্যাদি একেবারে বাজেয়াপ্ত না হইয়া তাহার স্বত্বাধিকারীর অর্থ দণ্ড মাত্র হইবে এরূপ বিধি হইল। কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে, এদেশে গবর্ণমেণ্ট এমন অসঙ্গত আজ্ঞা সকলও প্রচার করিতে পারেন এবং তাহা করিলেও বিশেষ উচ্চবাচ্য কিছু হয় না!

দেশীয় জনগণ মারীভয়ে ভীত এবং জঙ্গল সাফের পীড়াপীড়িতে যদিও ব্যতিব্যস্ত তথাপি এই সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে তাঁহাদিগের চিরদিন আনন্দ হয়। বিখ্যাত নাম দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে সিবিলিয়ান হইয়া ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আইসেন। যদিও বিজাতীয় মুসলমান রাজার অধীনে থাকিয়াও অত্যুচ্চ পদসকল একেবারে এদেশীয়দিগের একান্ত হস্তবহির্ভূত হইয়া যায় নাই, তথাপি সে বহুদিনের কথা। কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এদেশীয় জনগণ সম্ভ্রান্ত রাজকার্য্য হইতে,সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আবার এতদিনের পর সেই কার্য্যের দ্বার একটু উন্মুক্ত দেখিয়া, আপনাদেরই একজন, মহামান্য সিবিলিয়ানের পদ পাইলেন দেখিয়া দেশীয় জনগণ কেনই না আহ্লাদ যুক্ত হইবেন? কোন জাতির মধ্যে একজনও সম্ভ্রান্ত হইলে সমস্ত জাতিরই সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়।

এই সময়ে সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত সীমায় একটী গোলযোগ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহকারী সিপাহীগণ দেশ হইতে তাড়িত হইয়া কেহ কেহ সিন্ধুর পরপারে পার্ব্বতীয় স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়, এবং তথায় মুল্‌কা নামে একটী নগর সংস্থাপন পূর্ব্বক তত্রত্য লোকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকে। সিন্ধু পারবর্ত্তী পার্ব্বতীয় লোক সকল পরম সাহসিক সংগ্রাম-প্রিয় এবং ধর্ম্মোন্মাদে একান্ত মত্ত। তাড়িত সিপাহীদিগের সহিত ঐ সকল লোকের সম্মিলন হইলে তাহারা ইংরাজ রাজ্যে আসিয়া মধ্যে মধ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। ইংরাজেরা মুল্‌কা নগর দগ্ধ করিয়া পার্ব্বতীয়দিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরাজদিগের সৈন্য তাহাদিগের দেশে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া যাবতীয় পার্ব্বতীয় লোক ক্রোধান্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়। দুই একটি যুদ্ধও বিলক্ষণ ঘোরতর হয় এবং ইংরাজ সৈন্যের নির্গমণ পথ অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া পড়ে।

ইংরাজেরা একবার আফগানস্থানে প্রবেশ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইয়াছিলেন। সে শঙ্কাটি তাঁহাদিগের যায় নাই। আবার এই কাণ্ড উপস্থিত হইল। তাহাতে আবার ঐ সময়েই গবর্ণর জেনারেল এল্‌গিন বাহাদুর হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন। সমস্ত দেশময় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভায় তর্ক হইতে লাগিল কাহাকে গবর্ণর জেনেরল করিয়া পাঠান যায়, কে মুখ রক্ষা করে, রাজ্য রক্ষা করে। সকলেই স্থির করিলেন যে, যিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় পঞ্জাব প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে থাকিয়া ঐ নূতন বিজিত প্রদেশটীকে নিরুপদ্রব রাখিতে পারিয়াছিলেন, যিনি কানিঙ বাহাদুরের স্থানে কোন উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়াও পঞ্জাব হইতে সৈন্য পরিচালন পূর্ব্বক দিল্লী অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে ঐ নগর অধিকার করিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সেই মহানুভব লরেন্স সাহেব ভিন্ন আর কেহই এই আসন্ন বিপৎপাত হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার যোগ্য হইবেন না। স্যার জন লরেন্স ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিলেন। এক ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভিন্ন আর কোন সিবিলিয়ান সাহেব ইংলণ্ড হইতে

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেল হইয়া আইসেন নাই। লরেন্স সাহেবের ভাগ্যবৃক্ষে সেই অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্তি ফলিল। কিন্তু যে ভয় নিবারণ করিবার নিমিত্ত তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি এখানে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই তাহা নিবারিত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ সৈন্যেরা মূল্‌কা নগর ভস্মীভূত করিয়া বুস্‌ফজী আফগানদিগের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল।

এই সময়ে ভারতবর্ষের বাণিজ্য অধিক পরিমাণে বোম্বাই নগর হইতে নির্ব্বাহিত হইতে ছিল। বাঙ্গালার বাণিজ্য ৩৬ কোটি কিন্তু বোম্বাইয়ের ৫৩ কোটি হইয়াছিল। তূলার বাণিজ্যের ক্রমশঃ বিস্তারই ইহার কারণ। বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর তূলা জন্মে, এবং বোম্বাই নিবাসী পারসিক বণিকেরা এখানকার লোকদিগের অপেক্ষা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অধিকতর উৎসাহশীল। এই দুই কারণে বোম্বাইয়ের বাণিজ্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। এত বৃদ্ধি পাইল যে এখানকার তূলা ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইউরোপ হইতে ক্রমাগত রৌপ্য মুদ্রা আসিয়া পড়াতে এবং তাহার অধিকাংশ এ দেশে গহনা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া বদ্ধ হইয়া যাওয়াতে সর্ব্বত্র রৌপ্য মুদ্রার অভাব জন্মিয়া গেল। বিচার উঠিল যে পৃথিবীস্থ যাবতীয় রৌপ্য খনি হইতে প্রতি বর্ষে গড় ১০ কোটি টাকার রৌপ্য উত্তোলিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষে ১২ কোটি টাকা আসিয়া থাকে এবং সে টাকা আর বাহির হইয়া যায় না। এই জন্য রৌপ্য মুদ্রার অনাটন পড়িতেছে। যাঁহারা এরূপে বিচার করিতে লাগিলেন তাঁহারা এই পরামর্শ দিলেন যে, ভারতবর্ষে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত করা বিধেয়। স্বর্ণের মুদ্রা ইংলণ্ডেও চলে, অতএব যদি ঐ মুদ্রা এখানেও প্রচলিত হয় তবে আর ইউরোপ হইতে রৌপ্য মুদ্রা প্রেরণ করিতে হয় না। এই সকল কথা লইয়াও তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কিন্তু রাজার সচিব ট্রিবিলিয়ান সাহেব এবং ষ্টেট সেক্রেটরি স্যর চার্লস উড সাহেব বিশেষ মনোযোগ না করাতে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন স্থগিত রহিল এবং ক্রমে ক্রমে টাকার বাজার আবার নরম হইয়া আসিল।

অষ্টম অধ্যায়।

স্যর জন লরেন্স—বীডন।

স্যরজন্ লরেন্স সাহেব ১৮৬৪ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলিপুরে যে কৃষি প্রদর্শনী মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, লরেন্স বাহাদুর স্বয়ং তাহাতে উপস্থিত হইয়া মেলার কার্য্যারম্ভ করাইলেন। অনন্তর কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

তিনি যে সময়ে কলিকাতায় অবস্থিতি করেন সেই সময়ে আলিপুরের জেলে একটী কয়েদীর হত্যা হয়। সেই উপলক্ষে জেল তদারক সম্বন্ধে একটী কমিসন্ নিযুক্ত হইয়াছিল। স্যরজন ষ্ট্রেচি সাহেব ঐ কমিশনের সভাপতি ছিলেন। তিনি জেলের সমস্ত বিষয় তদারক করিয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রতি যথেষ্ট দোষারোপ করিলেন। জেলের স্বাস্থ্যবিধান বিষয়ে মনোযোগ পড়িল, আর বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহিত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের একটু মনোবাদ জন্মিয়া গেল। হাইকোর্টের সহিতও এই সময়ে বীডন্ সাহেবের মনান্তর উপস্থিত হয়, এবং তজ্জন্য তিনি কিঞ্চিৎ অপমানিতও হয়েন।

এদিকে নীলকরেরা আবার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বে নীলচাষার দর বাড়াইয়া টাকায় চারি বাণ্ডিল করিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। এক্ষণে টাকায় ছয় বাণ্ডিল লইতে লাগিল। সুতরাং রাইয়তদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল এবং মারপীট হইতে লাগিল। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট নীলকরদিগের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুতরাং শ্রীবৃদ্ধিকারী দলও বীডন্ সাহেবের উপর চটিয়া উঠিল।

বাঙ্গালী মহলেও বীডন্ সাহেবের প্রতি লোকের মন ভার হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার এক কারণ এই, ভাগীরথীতে শবনিক্ষেপ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর বিরক্তি প্রকাশ করিলে বীডন সাহেবও তাহার এবং নদীতীরে শবদাহের নিবারণ চেষ্টা করেন। তাহা করাতে

কলিকাতায় বাঙ্গালীদিগের একটী সভা হয়, এবং বীডন্ সাহেবের ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়। আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছিল। * পক্ষান্তরে চড়কের সময় বাণফোড়া এবং কাঁটা ফোড়া রহিত হইয়া গেল। উহা রহিত করিবার জন্য স্যর চার্লস্ উড্ সাহেবই প্রথম প্রস্তাব করেন এবং বোম্বাই প্রদেশে ও কিয়ৎপরিমাণে মান্দ্রাজে উহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রহিত হইয়া যায়। তখন অর্থাৎ ১৮৫৯অব্দে বীডন্ সাহেব বলিয়াছিলেন, চড়ক পার্ব্বণে এমত কোন নৃশংস ব্যবহার হয় না যে, ব্যবস্থা করিয়া তাহার নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু এখন আর সেই কথা চলিল না, তাঁহাকেই যত্ন করিয়া ঐ পর্ব্বের বিরুদ্ধে আজ্ঞা প্রচার করিতে হইল। তথাপি একথা বলিতে হয় যে কোন কোন বাঙ্গালী চড়ক নিবারণার্থ যেরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে উন্মুখ হইয়াছিলেন, বীডন্ সাহেব ততদূর করা আবশ্যক মনে করেন নাই। ফল কথা ডালহৌসির অধিকার কালে এদেশীয় প্রজাব্যূহের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার দৃষ্টি পড়িয়াছিল আবার সেইরূপ দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের সেবার নিমিত্ত যে বার্ষিক দেওয়া হইত তাহার পরিবর্ত্তে কতক ভূমি খুর্দার রাজাকে দেওয়া হইল এবং বার্ষিক বন্ধকরা হইল।

এই সময়ে গবর্ণমেণ্টও যেরূপ স্বধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ এবং পর ধর্ম্মের প্রতি বিরাগ দেখাইতে লাগিলেন সেইরূপ প্রজাদিগেরও মধ্যে, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে, কতক সেই ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনেককাল হইতে ভারতবর্ষনিবাসী মুসলমানদিগের ধর্ম্মোন্মাদ ন্যূন হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আবার তাহাদিগের মধ্যে স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অনেকেই ওয়াহেবী মত গ্রহণ করিল। ওয়াহেবী মত এই—পয়গম্বর মহম্মদের পর যে অপর কেহ ঈশ্বরানুগৃহীত হইয়া তৎকর্ত্তৃক প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, একথা অসত্য। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরা সকল সময়েই ঈশ্বরাবির্ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা লাভ

* গঙ্গাযাত্রা উপলক্ষে মুমূর্ষুর উপর অত্যাচার করিয়া শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু ঘটান হয় এই কথা উঠিলে বীডন সাহেব প্রস্তাব করেন যে পুলিসে খবর দিয়া গঙ্গাযাত্রা করাইতে হইবে। এ ব্যবস্থা অনুমোদিত হয় নাই।

করিয়া থাকেন। তাদৃশ ঈশ্বরাবির্ভূত ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলা নিতান্ত আবশ্যক। আর ঈশ্বরাবির্ভূত কোন ব্যক্তি কোন অধর্ম্মাচরণ করিলেই যে একেবারে অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়েন, তাহাও নহে। এই সকল মত প্রথমে আবদুল ওয়াহাব নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক আরব দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। অনন্তর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষেও নানা স্থানে প্রচারিত হয়। তাহা হওয়াতে এখানকার মুসলমানেরা যে পরিমাণে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পরিত্যাগ করেন। পরে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে এই সকল মতবাদ কোন বিশেষ কার্য্য করিয়াছিল কি না, নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। কিন্তু সিতানার যুদ্ধের সময় যে ভারতবর্ষীয় অনেক মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সাহায্যার্থ অনেক অর্থ প্রেরণ করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। পাটনা নগরেই ইহার বিশেষ ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু একথাও বলা আবশ্যক যে পল্লীগ্রামবাসী সামান্য মুসলমান রাইয়তেরাও মুষ্টিভিক্ষাদি দ্বারা এ বিষয়ে যথাশক্তি সাহায্য করিত বটে, কিন্তু তাহারা ইহার ভিতরের বিশেষ বিবরণ কিছুই অবগত ছিল না। তাহারা ধর্ম্ম কার্য্যে সাহায্য করিতেছে এই মাত্র জানিত।

হিন্দুসমাজের মধ্যেও এই সময়ে একটু ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সজীবতার চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায় যখন ১৮২৯ অব্দে ইংলণ্ড গমন করেন তখন প্রকাশ্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্তদিগের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় জন মাত্র ছিল। ১৮৩৯ অব্দে ব্রাহ্মের সংখ্যা একশত এবং ১৮৪৯ অব্দে পাঁচশত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৬৪ অব্দে ব্রাহ্মদিগের শাখাসমাজ ৪০টী এবং তাঁহাদিগের সংখ্যা দ্বি-সহস্রেরও অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। স্বল্প পরিমাণে ধর্ম্মোন্মাদের চিহ্নও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার একটু বাড়িল তেমনি উহার অভ্যন্তরে বিচ্ছেদের লক্ষণও দেখা দিল। একদল প্রাচীন প্রণালীর কতক পক্ষপাতী রহিলেন, অপর দল খৃষ্টীয় প্রণালীর দিকে সরিয়া হিন্দু আচারাদির প্রতি সমধিক বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মুসলমানদিগের এবং এই সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনের

একটী চমৎকার প্রভেদ এই, মুসলমানেরা বলেন যে,আমরা আপনাদিগের পূর্ব্ব ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত করিতেছি। হিন্দুরা বলেন, আমরা আপনাদিগের পূর্ব্ব ধর্ম্মের সংস্কার করিয়া লইতেছি। ধর্ম্ম ভক্তি-মূলক পদার্থ। উহার নূতন ব্যাখ্যাতা প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন। কিন্তু উহার সংস্কারকর্ত্তা উপস্থিত হইলেই কিয়ৎ পরিমাণে ভক্তির উচ্ছেদ হইয়া যায়। *

যাহাই হউক, ১৮৬৪ অব্দের ৬ই অক্টোবর একটী ভয়ঙ্কর ঝটিকার উপদ্রব হইয়াছিল। তাহাতে প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পত্তি এবং অনেক মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট হয়। ঝটিকার প্রাবল্য কিরূপ তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কলিকাতার সমীপে ভাগীরথী নদীতে ঐ দিন ১৯৮ খানি জাহাজ থাকে। ঝটিকায় তাহার ২১ খানি একেবারে বিনষ্ট, ১৩৯ খানি চূর্ণপ্রায়, এবং ৩৮ খানি কিয়ৎ পরিমাণে ভগ্ন হয়। কলিকাতার নিকট হইতে দক্ষিণে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় কূলে অন্যূন ৫০ সহস্র লোক মারা পড়িয়াছিল।

এই দৈব দুর্ব্বিপাকে বঙ্গদেশবাসীদিগের যে ক্লেশ হইয়াছিল তজ্জন্য সমদুঃখভাজন হইয়া বোম্বাই নগরের লোকেরা চাঁদা করিয়া এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। নিজ বাঙ্গালায় তাদৃশ কোন চেষ্টা হয় নাই। বস্তুতঃ বোম্বাই নগর এই সময়ে যৎপরোনাস্তি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেখানকার বণিকবর্গ এক একজন ধনকুবের হইয়া অজস্র অর্থদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। "

বোম্বাই নগরের তাদৃশ সমৃদ্ধিশালিতার কারণ উহার বাণিজ্য ইংলণ্ড প্রতি বর্ষে প্রায় ৪০ কোটি টাকার তূলা ক্রয় করিয়া যন্ত্রযোগে বস্ত্র

*সাধারণের বোধগম্যভাবে অত্যুচ্চ শাস্ত্রীয় তথ্যসকলের প্রচার ইদানী ব্রাহ্মেরাই আরম্ভ করেন। কিন্তু উহাঁদের উন্নতিশীল দলটী ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত দেশময় এইরূপ একটা বোধ জন্মিয়া যাওয়াতে হিন্দুসমাজ মধ্যে উহাদের বিস্তার ঘটিল না। সুলভ শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার ইহার পর রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ হইতেই আরব্ধ হওয়ায় এবং হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক এবং অতি সরল ভাবে শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতির দ্বারা হওয়ায় সনাতন আদর্শেই হিন্দুসমাজ বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া লইবেন এরূপ লক্ষণ সর্ব্বত্র দেখা গিয়াছে।

প্রস্তুত করেন। ঐ তুলা প্রথম কিছুকাল এদেশ হইতে মিশর হইতে এবং চীন হইতে ইংলণ্ডে যাইত। পরে মার্কিনেরা স্বদেশে তুলার চাষ উত্তমরূপে করিয়া ইংলণ্ডে তুলার রপ্তানি করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে ঐ বাণিজ্যটী আপনাদিগের একান্ত আয়ত্ত করিয়া লয়। সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে তুলার রপ্তানি এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ১৮৬১।৬২ অব্দে মার্কিনদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। সেখানে আর তুলার চাষও হয় না, আর বাণিজ্যবন্দরগুলি একেবারে অবরুদ্ধ হওয়াতে যে তুলা মজুত ছিল তাহাও বাহির হইতে পায় না। এরূপ হওয়াতে ইংলণ্ডেও সমূহ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। লাঙ্কাসাইয়ের প্রদেশের লোকেরা প্রধানতঃ কাপড়ের কলে খাটিয়াই আপনাদিগের জীবিকা অর্জ্জন করিত। তুলার অভাবে কাপড়ের কল বন্ধ হওয়াতে উহাদিগের মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। সেই দুর্ভিক্ষ ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত ভারতবর্ষে চাঁদা করিয়া অন্যূন ১২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত এবং ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, ইংলণ্ডে তুলার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি টান হইয়া যে তুলার দর প্রতি সেরে পাঁচ ছয় আনা মাত্র ছিল তাহা পাঁচসিকা দেড় টাকা হইয়া উঠিল। বোম্বাই প্রদেশে তুলার চাষের ধূম লাগিয়া গেল এবং বণিকেরা একেবারে ফাঁপিয়া উঠিল। বোম্বাইয়ের অনেকানেক সামান্য লোকেও এমন অর্থশালী হইল যে উচ্চ উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ইংরাজেরাও কেহ কেহ স্ব স্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং যাঁহারা কাজ না ছাড়িলেন তাঁহারাও আপনাদিগের দশা দেশীয় জনগণের অপেক্ষা হেয় দেখিয়া লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন।

গবর্ণমেণ্ট আপনার কর্ম্মচারিবর্গের বেতন বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত প্রথমে বোম্বাই হইতেই অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনন্তর একটী প্রাইস কমিশন (দ্রব্যাদির মূল্য নির্দ্ধারণ সমিতি) নিযুক্ত করিয়া যখন জানিলেন যে, ১৮৩০ অব্দ হইতে দেশের সর্ব্বত্রই ১৮৬০ অব্দ পর্য্যন্ত দ্রব্যাদির মূল্য তিনগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সম্প্রতি তাহা আবার দ্বিগুণিত হইয়াছে

তখন সর্ব্বত্রই বেতন বৃদ্ধির নিয়ম করিয়া দেওয়া হইল। সৈনিকদিগের সাহায্যার্থ ১৮১৪ অব্দের পূর্ব্বে যেমন পূরাভাতা দিবার নিয়ম ছিল সেই নিয়মও পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইল। উল্লিখিত 'প্রাইস কমিস্যনে'র দ্বারা অনুসন্ধান হইয়া ইহাই প্রকাশ পায় যে, ১৮৫০ অব্দ হইতে ১৮৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত এই চৌদ্দ বর্ষের মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং এখান হইতে আর বাহির হইয়া যায় নাই। এই জন্যই দ্রব্যাদির ঐরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বস্তুতঃ দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধিই বলা যাউক আর টাকার মূল্য ন্যূন হইয়াছে বলা যাউক উহা একই কথা। ঐ ব্যাপার ঘটাতে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের মধ্যে অপরাপর বিষয়ে মতামত উপস্থিত হইল এক এই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে ভূমিতে রাজস্ব সম্বন্ধে একটী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার কথা হইয়া প্রায় সমস্ত উদ্যোগই হইয়াছিল তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার সন্দেহ উপস্থিত হইল। কোন কোন রাজপুরুষ ভাবিলেন, এখানে ত দিন দিন টাকার মূল্য কম হইয়া যাইতে লাগিল, যদি এক্ষণে রাজস্বের পরিমাণ একেবারে অবধারিত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট আজি যত টাকা পাইবেন, পরেও তাহাই পাইবেন, কিন্তু বর্ষ কতিপয়ে সেই টাকার মূল্য ন্যূন হইয়া পড়িলে তদ্দ্বারা ত খরচ পোষাইবে না। তখন গবর্ণমেণ্টের অনাটন উপস্থিত হইবে, এবং সে অনাটন নিবারণ করিবার নিমিত্ত আর রাজস্ব বৃদ্ধি করিতেও পারিবেন না। অতএব রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই প্রতিকূল যুক্তি মনে মনে উপস্থিত হইলে ঐ বন্দোবস্ত সত্বরে নির্ব্বাহ করার পক্ষে অপর প্রতিবন্ধকও দৃষ্ট হইতে লাগিল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনেক ভূমিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত জল প্রণালীর জল লইয়া থাকে। প্রজারা জলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র কর দেয়। এক্ষণে সন্দেহ উপস্থিত হইল প্রজারা ঐ জলের নিমিত্ত যে কর দিয়া থাকে, তাহারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয় তবে প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় ভার হইয়া পড়ে; কারণ তাহারা ত সকলে সমপরিমাণে অথবা সকল সময়ে জল লয় না—অতএব সকলের উপর চিরকালের নিমিত্ত সমান কর

গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দিলে নিতান্ত অন্যায় হয়। এই কথা লইয়া আন্দোলন হইতে হইতে আবার একটী প্রতিবন্ধক অনুভূত হইল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিপক্ষ কোন কোন রাজকর্ম্মচারী বলিলেন যে, ভূমিতে প্রজাদিগের স্বত্ব কিরূপ আছে তাহার নিরূপণ না করিয়া জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী কোন বন্দোবস্ত করা উচিত নহে। ঐ পরামর্শানুসারে অযোধ্যা প্রদেশে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। সেখানকার তালুকদার সম্প্রদায় তাহাতে মহাভীত হইয়া পড়িল এবং লরেন্স সাহেব যে ভূম্যধিকারিবর্গের প্রতিকূল এইরূপ রাষ্ট্র হইয়া গেল। এ দিকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কয়েকটী নিয়ম প্রচারিত করা হইল; তন্মধ্যে একটী নিয়মানুসারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের হার উচ্চ ধরিয়া বলা হইল যে, যাহারা ইচ্ছা করিবে তাহারা উহা অপেক্ষা নিম্নহারে ত্রিশ বৎসরের নিমিত্ত যেমন সাময়িক বন্দোবস্ত হইয়া আসিতেছে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিবে। ফল কথা, উচ্চহারে কেহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিল না এবং উত্তর পশ্চিমে যেমন সাময়িক বন্দোবস্ত ছিল তাহাই রহিয়া গেল। বাঙ্গালার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সহিত জমীদারদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে—অতএব তাহা লইয়া আর কোন গোলযোগ হইতে পারিল না।

এ দেশে ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা লইয়া চিরকালাবধি বিবিধ মতামত চলিয়া আসিতেছে। ভূমিতে স্বত্ব কাহার; রাজার কি প্রজার কি জমিদারের তাহা কখনই নিশ্চয় করিয়া কাজ করা হয় নাই। রাজার রাজস্ব না দিলে যখন একেবারে জমীদারিই বিক্রীত হয়, জমীদারের অন্য কোন সম্পত্তির উপর হাত পড়ে না, তখন ভূমিতে রাজারই স্বত্ব আছে মনে করিতে হয়, আবার আইনে জমীদারকে পুনঃ পুনঃ ভূমির স্বত্বাধিকারী বলা হইয়াছে, এবং চিরকালের নিমিত্ত মৌরসী পাট্টা দিবার অধিকার পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং জমীদারের যে স্বত্ব নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না, অপ্রস্তখোদকস্ত প্রজাকে কোন জমিদার উঠাইতে পারেন না এবং তাদৃশ প্রজার খাজানা যথেচ্ছরূপে বাড়াইতেও পারেন

না, ইহা দেখিলে প্রজাদিগেরও একপ্রকার স্বত্ব আছে বলিতে হয়। বাস্তবিক ভারতবর্ষের ভূমিতে ঐ ত্রিবিধ স্বত্বই স্বীকার করিতে হয়।

অতি পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজাদিগের সময়ে যেরূপই থাকুক, ১৫৪০ অব্দে মুসলমান বাদসাহ সের শাহের সময় হইতেই খেরাজ-গ্রহণের প্রকৃত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন রীতির বিনাশ আরম্ভ হয়। তিনি রাজার প্রাপ্য, জমীদারের প্রাপ্য, এবং গ্রামিকদিগের প্রাপ্য স্থির করিয়া দেন। অনন্তর আকবর সাহের সময়ে ঐ ব্যবস্থা কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া সমুদায় সাম্রাজ্যে প্রচলিত থাকে। ঐ অবধারিত অংশের নাম আসল। অনন্তর প্রজাবৃদ্ধি সহকারে কৃষ্যুৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি, অথবা রাজার প্রয়োজন কিম্বা তাঁহার দৌরাত্ম্য ইত্যাদি বিবিধ কারণে ঐ আসলেরও অতিরিক্ত মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লওয়া হইত—তাদৃশ অতিরিক্ত রাজস্বের নাম আবোয়াব। এই আবোয়াব রাজাও আদায় করিতেন এবং তাঁহার দেখাদেখি জমীদারেরাও আদায় করিত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানি দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ কিছুকাল জমীদারদিগের সহিত প্রতি বর্ষে নূতন বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তাহাতে বর্ষে বর্ষে খাজানা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং জমীদারেরা ঐ খাজানার একাদশ ভাগের এক ভাগ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কোন কোন স্থানে পাঁচ বর্ষের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হইয়া পরিশেষে একবারে দশ বর্ষের নিমিত্ত বন্দোবস্ত হইল এবং সেই বন্দোবস্ত ১৭৯৩ অব্দের আইনের দ্বারা চিরস্থায়ী হইয়া গেল। তথাপি কিছু কাল জমীদারেরা কাঁহাকেও চিরস্থায়ী পাট্টা দিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন না। সে অধিকার ১৮১২ অব্দে তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইল।

এইরূপে জমীদারের স্বত্ব ক্রমশঃ বলবৎ হইয়া উঠিলে এবং রাজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা কর বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিলে আবোয়াব গ্রহণ করা না করা জমীদারদিগের আয়ত্ত হইয়া থাকিল। জমীদারেরা তাহা করিতে লাগিলেন। সেই জমার অতিরিক্ত কোন প্রকারে কিছু

আদায় যে জমীদারের ইচ্ছা-মত হইতে পাইবে না—কৃষ্যুৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধির অনুক্রমেই হইতে পারিবে, এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে এই নিয়মটী স্পষ্টতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।*

এক্ষণে কৃষ্যুৎপন্ন শস্যাদির মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব ভূমির খাজানাও বাড়িবে এই বলিয়া জমিদারগণ খাজানা বাড়াইতে লাগিলেন। সাধারণ প্রজাকে বর্দ্ধিতহারে খাজনা স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু খোদ্‌কেস্ত প্রজারা বর্দ্ধিত হারে খাজনা দিতে অস্বীকৃত হইল। আদালত সকল মোকদ্দমায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।† একবার নিশ্চয় হইল যে, প্রজার সম্বন্ধে জমিদার 'নীলামি হার' পর্য্যন্ত রাজস্ব বাড়াইতে পারেন। দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অবশেষে এই স্থির হইল যে, কৃষ্যুৎপন্নের মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জমিদার সেই পরিমাণের অনুক্রমে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারেন, তদতিরিক্ত পারেন না।

এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, বাঙ্গালার মধ্যে যে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা একবার প্রশমিত হইল।

১৮৬৫ অব্দের অনাবৃষ্টিতে উড়িষ্যার যে কত ক্ষতি হইয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় শত বর্ষের মধ্যে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই এবং ঐ দেশে মাটির নীচে ধান পুতিয়া রাখার ব্যবস্থা থাকায় বাঙ্গালা দেশে যেমন গোলা খালি দেখিয়া স্থূলদৃষ্টি কর্ম্মচারীরাও বুঝিতে পারেন যে সঞ্চিত ধান্য নাই, উড়িষ্যায় তাহা হইতে পারে নাই।

---

* ১৮৫৯ সালের ভারত ব্যবস্থাপক সভার ১০ আইন ১৭ দফার জমাবৃদ্ধির সুসঙ্গত কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল (১) মাপে জমি বৃদ্ধি (২) নিকটবর্ত্তী সেই প্রকারের জমির খাজনার হার বেশী থাকা. (৩) কৃষ্যুৎপন্নের পূর্ব্বাপেক্ষা মূল্য বৃদ্ধি। আইনের ১০ ধারায় আবোয়াব আদায়ে ও খাজনার রসিদ না দেওয়ায় দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

† এই সালে বহুসংখ্যক খাজনার মোকদ্দমার আপীল নিষ্পত্তির ব্যবস্থা জন্য বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৬৭ অব্দের ৪ আইনে ডেপুটী কলেক্টরদিগকে আপীল শুনিবার অধিকার দেওয়া হয়।

কমিশনর র‍্যাভেনশা সাহেব রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে ধান পুতিয় রাখিয়া মহাজনেরা দুষ্টামি করিয়া দর বাড়াইতেছে। জমিদারগণ দুর্ভিক্ষ জন্য জমা মাফ করার আবেদন করিলে রেভিনিউ বোর্ড তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে ওরূপ অনুসন্ধান করিতে গেলে শুধু শুধু সকলেই মাফ চাহিবে এবং অনর্থক গোলযোগ উপস্থিত হইবে। কিন্তু যখন বাজারে শস্য বিক্রয়ার্থ আসা বন্ধ হইল, যখন জেলখানার কয়েদীদের জন্যও আহার্য্য ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা সুকঠিন হইল, তখন (মে ১৮৬৬) সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইল যে উড়িষ্যা প্রদেশে ধান চাউল একেবারেই নাই, আমদানী করিয়া না আনিলে নয়! কিন্তু তখন দক্ষিণে বাতাস প্রবল, জাহাজ সহজে উড়িষ্যার উপকূলে লইয়া যাওয়া যায় না, স্থলপথে রাস্তা একটী মাত্র এবং অনেক নদী পার হইতে হয়, দক্ষিণে গঞ্জাম প্রদেশেও তখন দুর্ভিক্ষ, সেদিক হইতেও শস্য আসিতে পারে না। প্রয়োজন হইলেই সর্ব্বত্র আবশ্যকমত দ্রব্যজাত বিক্রয়ার্থ আপনা হইতেই মহাজনে লইয়া যায় একথা যেখানে যেখানে যাতায়াত সুগম তাহার পক্ষেই খাটে। তখন উড়িষ্যার পক্ষে ও কথা যে খাটিত না তাহা সরকারী কর্ম্মচারীরা বুঝিতেই পারেন নাই। অর্থনীতি বা অন্য যে কোন শাস্ত্রের শুধু বাঁধা গত শিখিয়া রাখার দোষ এতই অধিক। বিপদ আসার পর সমস্ত বুঝিতে পারিয়া নবেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টায় অনেক খরচে গবর্ণমেণ্ট প্রায় তিন লক্ষ মন শস্য আমদানী করিয়া বিনা মূল্যে ও স্বল্পমূল্যে বিতরণ করিলেন। কিন্তু ততদিনে উড়িষ্যার তৃতীয়াংশ লোকের অর্থাৎ ১০ লক্ষের অনাহারে মৃত্যু হইয়া গিয়াছিল!

এই দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্টের পৌনে দুই কোটি মুদ্রা খরচ হয় অথচ সময়ে কার্য্যারম্ভ না হওয়ায় প্রজা হানি এতই অধিক হইয়াছিল। মেদিনীপুর, হুগলী, বীরভূম ও নদীয়াতেও যথেষ্ট অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল জেলা ও উড়িষ্যা হইতে সহস্র সহস্র লোক কলিকাতায় আসি পড়িয়াছিল। দেশীয় জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অনেকেই এই সময় যথেষ্ট অন্নদান করিয়াছিলেন।

১৮৬৭ অব্দের সুবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইল। গবর্ণর জেনেরেল বীডন সাহেবের উপরই দোষ দিলেন—বলিলেন "অন্যান্য স্থানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণ যেমনই বিপদ হউক না দূরদর্শিতায় এবং ক্ষিপ্রকারিতায় ইংরাজ রাজত্বের মুখ রক্ষা করিয়াছেন—১৮৬৫ অব্দের শেষ ও ১৮৬৬ অব্দের প্রথম অংশে বাঙ্গালার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না।" কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টও, প্রথমে দুর্ভিক্ষ হয় নাই এই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের ও ষ্টেট সেক্রেটারীর সহিত এই সকল বিষয়ে লেখালেখির সময়েই বীডন সাহেবের কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়ায় তিনি স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন (১৮৬৭)।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ব্যবস্থানুসারে তিনি ১৮৬২ অব্দের ৭ই জানুয়ারিতে বাঙ্গালার ৭টী জেলায় কয়েকটী অপরাধ সম্বন্ধে জুরির বিচার প্রচলিত করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্মত্যাগের পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়া যান যে দায়রায় বিচারের উপযুক্ত সর্ব্ব শ্রেণীর মোকদ্দমায় সুধা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই জুরির বিচার প্রচলিত হওয়া উচিত।

মিউটিনির পর এদেশীয়দিগের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করায় যখন লর্ড ক্যানিং স্বজাতির নিকট অপ্রিয় হইয়াছিলেন, তখন বীডন সাহেবই তাঁহার সহকারী এবং তখন হইতেই অনেক ইংরাজের অপ্রিয় হয়েন। ছোট আদালতের স্থাপনায় ও বিচারকদিগের বেতন বৃদ্ধির দ্বারা দেওয়ানী বিচারের উন্নতি, মিউনিসিপালিটীর শ্রীবৃদ্ধি জন্য আইন প্রণয়ন, দেশীয় ভাষায় নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষায় বিস্তার জন্য বিশেষ চেষ্টা, শিল্প শিক্ষা দেওয়ার জন্য আর্ট স্কুল স্থাপনা, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রকৃত প্রস্তাবে সমাদর করা প্রভৃতি বিষয় স্মরণ করিয়া উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধে তাঁহার একান্ত অকৃতকার্য্য হওয়া সত্ত্বেও বীডন সাহেবের প্রতি এদেশীয় সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

পরিশিষ্ট।

—:*:—

বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ।

কোন দেশের ইতিহাস উত্তমরূপে জানিতে হইলে প্রথমে সেই দেশের ভৌগোলিক বিবরণ জানা আবশ্যক। দেশটী পৃথিবীর কোথায়—উহার প্রকৃতি কি—উষ্ণ কি শীতল, জল বায়ু কেমন—স্বাস্থ্যকর কি অস্বাস্থ্যকর, মৃত্তিকা উর্ব্বরা কি অনুর্ব্বরা উহাতে কিরূপ খাদ্য সামগ্রী কেমন পরিশ্রমে উৎপন্ন হয়—উহাতে আকরিক কি কি পাওয়া যায়, কেমন সকল জন্তু থাকে, কি প্রকারের মনুষ্যেরা বাস করে—এই সমস্ত বিবরণ স্থূল স্থূল না জানিলে দেশের ইতিহাস কখনই ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

বঙ্গদেশের একখানি মানচিত্র লইয়া দেখিলেই বোধ হইবে যে, এই দেশটী উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত সীমায় (দার্জ্জিলিঙ্গে) হিমালয় স্পর্শ করিয়া ক্রমে বিহার প্রদেশ, সাঁওতাল পরগণা এবং ছোটনাগপুর অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দক্ষিণে নামিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া হিজলী কাঁথির নিকট হইতে বঙ্গোপসাগর নামক সমুদ্রভাগের উত্তরে পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। অনন্তর রামুর সন্নিধানে আরাকান প্রদেশ স্পর্শ করিয়া পূর্ব্ব দিকে কতকগুলি পর্ব্বত-শ্রেণীর ব্যবধানে ব্রহ্মদেশ এবং মণিপুর রাখিয়া আসাম পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইহার উত্তরভাগে নাগা জয়ন্তী খাসি এবং গারো পর্ব্বত মালা আসাম প্রদেশের কিয়দংশ এবং ভুটান ও সিকিমের রাজ্য। দেখিতে দেখিতেই বোধ হইবে যে, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূভাগ কখনই ইহার প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশ সমস্ত হইতে নিতান্ত পৃথক্‌ভূত হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং আসাম এই কয়েকটী প্রদেশের সহিত একান্ত লগ্ন হইয়াই আছে। ইতিহাসেও বাঙ্গালার সহিত ঐ সকল প্রদেশের চিরকাল অতি নিকট সম্বন্ধ। এক্ষণের ত কথাই নাই। অল্পকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালা ঐ সকল প্রদেশের সহিত একীভূত হইয়াই এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারীর (লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণরের) কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল—এক্ষণে আসামের জন্য পৃথক চীফ কমিসনর নিযুক্ত আছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্বকালের ইতিহাসেও দৃষ্ট হয় যে, যিনি বিহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন, বাঙ্গালাও তাঁহার অধীন হইয়া পড়িয়াছে—যিনি উড়িষ্যার প্রধান হইয়াছেন, তিনিও বাঙ্গালার মধ্যে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে গিয়াছেন—যিনি আসামে প্রবল হইয়াছেন, তিনি বাঙ্গালারও সন্নিহিতভাগে আপন

প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, বাঙ্গালার আধিপত্য হইলেই বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের প্রতি আধিপত্য বিস্তারের স্পৃহাটী যেন সহজেই জন্মিয়া যায়। বাঙ্গালার কর্ত্তা হইলেই ঐ সকল প্রত্যন্ত দেশের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করাও যেন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

দেশের এবং তাহার ইতিহাসের প্রকৃতি তত্রত্য প্রধান নদীর প্রকৃতির উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। যে দেশে কোন বৃহৎ নদী বর্ত্তমান থাকে, সে দেশটী প্রকৃত প্রস্তাবেই নদীমাতৃক অর্থাৎ সে দেশ ঐ নদী-কর্ত্তৃকই প্রসূত। যে দেশে কোন বৃহৎ নদী বিদ্যমান সে দেশে কোন্ দিক হইতে প্রথমে মনুষ্য সঞ্চার হইয়াছিল, কোথা হইতে বিজিগীষু রাজগণ আসিয়াছিলেন তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। যেমন নদীপ্রবাহ ধরিয়াই প্রস্তর বালুকা এবং মৃত্তিকাদি আসিয়া প্রথমতঃ চরের, পরে ক্ষেত্রের, অনন্তর গ্রামের এবং পরিশেষে দেশের সৃষ্টি করে, সেইরূপে নদীর তীরে তীরেই বিজিগীষু রাজগণ আপনাদিগের সৈন্য পরিচালন করিয়া থাকেন। নদীতীর ধরিয়াই উপনিবেশের সংস্থাপন হয়।

বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর হইতে গঙ্গা এবং পূর্ব্বোত্তর হইতে ব্রহ্মপুত্র—এই দুইটী অতি বৃহৎ জলরাশি হিমাচলের অঙ্গ ধৌত করিয়া যে মৃত্তিকা আনয়ন করিয়াছে তাহাই বহু কালে ক্রমে ক্রমে জমা হইয়া প্রকৃত বঙ্গভূমি জন্মিয়াছে। গঙ্গা গাজিপুর নগরের সন্নিধানে বিহার প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তর দিক হইতে ঘর্ঘরা এবং দক্ষিণ দিক হইতে শোণের জল পাইয়াছেন। অনন্তর হাজিপুরের নিকটে গণ্ডকী নদী এবং ভাগলপুরের নিকটে কুশী (বা সরযূ) নদীও উত্তর দিক হইতে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এপর্য্যন্ত গঙ্গার গতি পূর্ব্বাস্য। পরে রাজমহলের পাহাড় উত্তীর্ণ হইয়াই গঙ্গা একবারে দক্ষিণাভি-মুখ হইয়াছে এবং সেই অভিমুখে ভাগীরথী নদীকে বাহির করিয়া দিয়াছে। গঙ্গার গতি ঐ স্থান হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখ, অনন্তর উহার সহিত ব্রহ্মপুত্রের প্রধানতম শাখা যমুনা নদীর সংযোগ এবং সংযোগ স্থান হইতে উভয়ের সম্মিলিত গতি ঈষৎ পূর্ব্ব, অধিকাংশ দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের সাগরাভিমুখে গতি যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, আদিমকালে বাঙ্গালা দেশে মনুষ্য সঞ্চারও ঐ দুই নদীর অনুক্রমে হইয়াছিল এরূপ মনে করা অসঙ্গত বোধ হয় না। গঙ্গা এবং তাহার করপ্রদা নদীগুলির কূলে কূলে আসিয়া আর্য্যজাতীয়েরা এই দেশে বঙ্গপ্রবেশ হন। অনন্তর তাঁহারা ব্রহ্মপুত্রের সহিত গঙ্গার সঙ্গমস্থল প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে আবার ঐ নদের তীরে তীরে উত্তর মুখে গমন করেন। যিনি বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইবে যে, গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের উপকূলস্থলেই আর্য্য-বহুল—অপরাপর অংশের লোকেরা সে পরিমাণে আর্য্যমুখশ্রী এবং শরীরসৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে। ছোটনাগপুর,

সাঁওতালপরগণা, চট্টগ্রাম বিভাগ, খাসি জয়ন্তী পর্ব্বত এবং কুচবিহার প্রদেশ, এই সকল স্থান গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের দূরবর্ত্তী পর্ব্বতময় বনাকীর্ণ। ঐ সকল স্থানের অধিবাসিগণের মধ্যে অনার্য্য উপাদানের আধিক্য সহজেই অনুভূত হয়।

কোন দেশের প্রধানতম নদীর গতি দেখিলেই সেই দেশটীর কোন ভাগ উচ্চ, কোন ভাগ নীচ তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালার প্রধান নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র। তন্মধ্যে গঙ্গা ইহার পশ্চিম উত্তর দিক হইতে আসিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র উত্তর পূর্ব্ব হইতে আসিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে গিয়াছে। এই দেশটীর উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ উচ্চভূমি এবং দক্ষিণ ভাগ ক্রমনিম্ন। যে স্থানে গঙ্গা এবং (ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা) যমুনার সম্মিলন সেই ভাগের ভূমি সর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর নিম্ন।

উচ্চ ভূমিতে প্রায়ই পর্ব্বত থাকে অথবা উচ্চভূমি মাত্রই পর্ব্বত-সন্নিহিত হয়। বাস্তবিক বাঙ্গালার উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বত—ইহার পশ্চিম ভাগে বিন্ধ্য পর্ব্বতের শাখা প্রশাখা এবং ইহার পূর্ব্ব দিকেও একটী পর্ব্বত মালা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে হিমালয়ের যে ভাগ বাঙ্গালার সন্নিহিত তাহার সর্ব্বোচ্চ গিরি কাঞ্চনশৃঙ্গ নামে বিখ্যাত। উহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৮ হাজার ফুট উচ্চ। বিন্ধ্যাচলের যে খণ্ড বাঙ্গালার পশ্চিমাংশের অন্তর্গত তাহার প্রধান গণ্ডশৈল পরেশনাথ পর্ব্বত নামে খ্যাত। উহার উচ্চতা ৪ হাজার ৫ শত ফুট। বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকে যে সকল পর্ব্বত আছে তাহারও কোন কোনটীর শৃঙ্গ ১১।১২ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। এই সকল পর্ব্বত এবং পার্ব্বতীয় দেশে অনেকানেক অনার্য্য জাতির বাস। বোধ হয়, কোন সময়ে উহারাই আপনাপন সন্নিহিত সমতল দেশ ভাগও অধিকার করিয়াছিল। আর্য্যেরা আসিয়া তাহাদিগের স্থানে নদীমাতৃক সমস্ত উর্ব্বরা ভূমি গ্রহণ করিলে উহারা ঐ সকল পর্ব্বত ও বনময় স্থানে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করে। উত্তরদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতে যাহারা বাস করে, তাহারা এক্ষণে গুর্খা, ভোট, লেপ্‌চা, আবর, মেক্ এবং গারো প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া আছে। পশ্চিম-দিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতনিবাসীরা সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, গোন্দ এবং কোল নামধারী হইয়াছে। পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতীয়দিগের নাম, লুসাই, খাসি এবং কাছাড়ি। এই সকল অসভ্য জাতির মধ্যে যাহারা উত্তরদিক্‌নিবাসী, তাহাদিগের আকার কতক তাতারীয়দিগের ন্যায়—যাহারা পূর্ব্বদিক্‌নিবাসী তাহাদিগের আকার কিয়ৎপরিমাণে ব্রহ্মদেশীয়দিগের ন্যায়—কিন্তু যাহারা পশ্চিমদিক্‌নিবাসী, তাহাদিগের আকার ভারতবর্ষের বহিঃস্থ অপর কোন দেশের লোকের ন্যায় নহে। অনুমান হয় উহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতভূমির আদিম অধিবাসী ছিল। এক্ষণে অল্পমাত্রাবশেষ হইয়াছে। পার্ব্বতীয় জাতীয়েরা কেহ অল্প কেহ অধিক পরিমাণে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-

প্রণালী এবং আচার গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা হিন্দুজাতির সংস্রব অধিক পাইয়াছে তাহারা গো ব্রাহ্মণের সম্মাননা করে, যাহারা ঐ সংস্রব অল্প পাইয়াছে তাহারা তাদৃশ সম্মাননা করে না।

পৃথিবীর যে ভাগে যে দেশ অবস্থিত হয়, প্রায়ই সেই অবস্থানের অনুসারে উহার বায়ু উষ্ণ বা শীতল হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশ ১৯·১৮ এবং ২৮·১৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮২ ও ৯৭ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশের অন্তর্ব্বর্ত্তী, অতএব উহার অধিকাংশই পৃথিবীর উষ্ণ-কটিবন্ধের বহির্ভাগে অবস্থিত। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অতি উষ্ণ প্রদেশের মধ্যেই গণ্য। এক বৎসর ধরিয়া এখানে তাপমান দ্বারা দৈনিক গড় উত্তাপ দেখিলে বৎসরের গড়ে প্রায় তাপমানের ৭৯° পাওয়া যায়। ইহাকে বার্ষিক তাপমান বলা যাইবে। কিন্তু তাপের পরিমাণ বাঙ্গালার সকল ভাগে অথবা বর্ষের সকল সময়ে সমান থাকে না। যে ভাগ সমুদ্রকূল হইতে যেমন দূর তাহার বার্ষিক তাপমানের ইতর বিশেষ প্রায়ই তত অধিক হয়। উত্তর পূর্ব্ব কোণে (কাছাড় প্রদেশে) অথবা উত্তর পশ্চিম কোণে (পাটনা প্রদেশে) গ্রীষ্মকালে যেমন গ্রীষ্ম অধিক শীতকালেও তেমনি শীত অধিক হয়। কিন্তু সমুদ্র সন্নিহিত কলিকাতা অথবা চট্টগ্রামে ওরূপ শীত গ্রীষ্মের ভয়ানক আতিশয্য হয় না। সমুদ্র সন্নিহিত প্রদেশের বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকিতে পায়—সমুদ্র হইতে দূরস্থ প্রদেশের বায়ুতে জলীয় বাষ্প অল্প থাকে, এই জন্যই ওরূপ প্রভেদ ঘটে। বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের বায়ুতে যত অধিক জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তেমন আর কুত্রাপি নহে। বিশেষতঃ ইহার যে ভাগ সর্ব্বাপেক্ষায় নিম্ন তাহার বায়ু একান্ত বাষ্পপূর্ণ। উষ্ণপ্রধান দেশবাসীরা প্রায়ই পরিশ্রমকাতর হয়। প্রকৃত বঙ্গদেশনিবাসিগণ যদিও নিতান্ত শ্রমবিমুখ না হউন, তথাপি শৈত্য প্রধান দেশবাসী ইউরোপীয়দিগের ন্যায় কিম্বা পর্ব্বতনিবাসী কষ্টজীবী মনুষ্যদিগের ন্যায় বিশেষ শ্রমশীল নহেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যে অনেকটা শ্রমশীলতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দেশের গুণে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর্য্যবংশ-সম্ভূত তাহারই পুরুষানুক্রমিক পরিণামদর্শিতার ফল ঐ শ্রমশীলতা।

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ দিকের বায়ু নিতান্ত জলসিক্ত। ঐ বায়ু যেখানে পর্ব্বত দ্বারা সংরুদ্ধ হয় তথায় তাহার বাষ্প ঘনীভূত হইয়া অজস্র ধারে বারি বর্ষণ করে। বাঙ্গালার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বততলীতে পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জি নামক যে প্রসিদ্ধ নগর বাঙ্গালার [illegible] ভাগে অবস্থিত তাহার বার্ষিক বৃষ্টিমান ৫২১ ইঞ্চি। বৃষ্টি অধিক পরিমাণে হইলেই উদ্ভিদ জন্মে—কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়—এবং অনায়াসেই মনুষ্যের খাদ্যসামগ্রী উৎপন্ন

হইয়া থাকে। বাঙ্গালার কৃষিকার্য্য অতি সহজ। কৃষিকার্য্য সহজে নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া এখানকার লোকের অবকাশ অধিক এবং তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চায় উন্মুখ। বঙ্গদেশনিবাসীরা চিরকালাবধি লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন এবং বিদ্যাবত্তার যৎপরোনাস্তি গৌরব করেন। কিন্তু বাঙ্গালা অতি বিস্তীর্ণ দেশ। ইহার পরিমাণ ফল ২৫১৭৩৮ মাইল। এই সুপ্রশস্ত ভূভাগের সর্ব্বত্রই যে এক প্রকৃতিক তাহা হইতে পারে না। ইহার সর্ব্বত্র সমান উষ্ণ বা উর্ব্বরা নয়। সকল স্থানে বৃষ্টিপাত সমান হয় না। বায়ুর উপর বৃষ্টির পরিমাণ নির্ভর করে। শীত ঋতুতে যে উত্তর বায়ু বহে তাহা হিমালয়ের নিম্নদেশ হইতে আইসে। ঐ সময়ে হিমালয়ের উর্দ্ধভাগে দক্ষিণ দিকের বায়ু বহিয়া থাকে। শীতকালে সমুদ্র হইতে প্রবাহিত জলসিক্ত উচ্চ বায়ু প্রবাহের অধিকাংশ জলই হিমাচলে তুষারসম্পাতে পর্য্যবসিত হয়। কিছু অংশ নামিয়া পড়ে এবং উত্তর দিক হইতে যে নিম্নের বায়ু প্রবাহ তখন চলিতে থাকে তাহার সহিত মিশে। এই দুই বায়ু প্রবাহের সম্মিলনে অল্প অল্প বৃষ্টিপাত হয়। তাহাতে বিহার প্রদেশে ছোটনাগপুরে এবং বাঙ্গালার মধ্যভাগে রবিশস্য জন্মে। গ্রীষ্মঋতুর প্রারম্ভে দেশের উপরিস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইয়া উর্দ্ধে উঠে এবং উর্দ্ধ দিয়া সমুদ্রের দিকে যায়। দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী সমুদ্র হইতে দক্ষিণে বায়ুর প্রবাহ জমির ঠিক উপর দিয়া বহিতে আরম্ভ হয়। ঐ বায়ু প্রথমতঃ দেশের অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যন্ত যায় না, সমুদ্রের কূল লইয়াই থাকে। অনন্তর উহা ক্রমে ক্রমে দেশের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। এই সমুদ্রাগত বায়ুর সহিত ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হইতে আগত পশ্চিম বায়ুর যে সংঘাত হয় তাহাতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝটিকা সমস্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরে যখন সমুদ্র বায়ুর বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠে—তখন আর ঝড় হয় না—বর্ষা ঋতু প্রবৃত্ত হইয়া যায়। ঐ বর্ষার আগমনে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান আহারীয় যে তণ্ডুল তাহার চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যে সকল ঝটিকার উৎপাত হয় তাহার মধ্যে যেগুলি অধিক ভয়ানক সেগুলি প্রায়ই বঙ্গোপসাগরে জন্মে। অনন্তর উত্তর পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দেশের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাহার সর্ব্বনিম্ন যে ভাগ তাহাতেই বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিয়া চলিয়া যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন কার্ত্তিক এই কয় মাসেই ঝটিকার উৎপত্তি অধিক হয়।

বাঙ্গালা দেশে এই যে দুইটী প্রধান বায়ুপ্রবাহ বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রবাহিত হয় এবং তজ্জন্য বৎসরের মধ্যে যে দুইটী সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইতে এই দেশে দুই প্রকার প্রধান শস্যসম্পত্তি—ধান্য ও কলাই জন্মে। তাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু দেশটীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা বিভিন্নরূপ। সুতরাং

দেশের নানা স্থানে নানা দ্রব্য জন্মে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী অতি প্রধান। পাট, শণ, মসিনা, তিল, সর্ষপ, সুয়ারগুজা, তুলা, তামাক, চা, নীল, আফিম। এই সকল কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য দ্বারা অনেক লোকের প্রতিপালন এবং দেশে যথেষ্ট অর্থের সমাগম হয়।

এই সকল দ্রব্য ভিন্ন বাঙ্গালায় বিবিধ উপজীব্য বৃক্ষও জন্মে। তন্মধ্যে আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল, কদলী, তাল, গুবাক, অতি প্রসিদ্ধ। এই দেশের বন ভূমিতে শাল, সুন্দরী, গরান প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী, অনেক কাষ্ঠ পাওয়া যায় এবং বাঁশ ইহার সর্ব্বত্রই জন্মে।

বাঙ্গালার বন্য জন্তুর মধ্যে হস্তী, মহিষ, বরাহ এবং ব্যাঘ্র প্রধান। আসাম প্রদেশে, উড়িষ্যায়, ছোটনাগপুরে, ত্রিপুরায় এবং চট্টগ্রামে বনহস্তী পাওয়া যায়। পূর্ণিয়া এবং ঢাকা জিলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহপালিত মহিষ আছে। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই গোরু, ঘোড়া, ছাগ এবং মেষ যথেষ্ট। কিন্তু ঐ সকল গৃহপালিত জন্তু প্রায়ই দুর্ব্বল এবং খর্ব্ব শরীর।

বাঙ্গালানিবাসী মনুষ্যগণও সাধারণতঃ খর্ব্ব শরীর এবং দুর্ব্বল। কিন্তু সর্ব্বত্র সমান নয়। ফলতঃ বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ আকারগত বৈসাদৃশ্য আছে, বোধ হয় পৃথিবীর অপর কোন একদেশবাসী লোকের মধ্যে সেরূপ বৈসাদৃশ্য নাই। বাস্তবিক বাঙ্গালীরা এপর্য্যন্ত একটী সম্মিলিত জাতি হইয়া উঠেন নাই। ইহাঁদিগের মধ্যে যদিও ক্রমশঃ ধর্ম্মের একতা এবং ভাষার একতা হইয়া আসিতেছে এবং এক্ষণে এক-রাজতাও জন্মিয়াছে তথাপি এপর্য্যন্ত প্রকৃত জাতীয়ভাব বা একজাতিত্ব জন্মে নাই। বহুকাল একরাজতা না থাকিলে এরূপ বিভিন্নাকার ও বিভিন্ন প্রকৃতিক লোকের মধ্যে একজাতিত্ব জন্মিতে পারে না।

বাঙ্গালা দেশবাসীদিগের প্রস্তুত শিল্পজাত সমুদায় অনেকাংশে পরস্পর একরূপ হইয়াও স্থানভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। স্থূলতঃ বাঙ্গালার সকল স্থানেই সূত্রধর, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কাংস্যবণিক তৈলকার প্রভৃতির ব্যবসায় চলিয়া থাকে। প্রায় এমন গ্রামই নাই যেখানে ঐ সকল কারুকার্য্য ব্যবসায়ী দুই একজন লোকের বাস নাই। বস্ত্র বয়নও সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। কিন্তু মেদিনীপুরের মাদুরী, মুর্শিদাবাদের চেলী, মালদহের ছিট, ঢাকা এবং কটকের অলঙ্কার, চট্টগ্রামের নৌকা এবং হড়ি যেমন উত্তম হয় এদেশের আর কুত্রাপি সেরূপ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ইউরোপীয় শিল্পজাত এতদ্দেশীয় শিল্পজাত অপেক্ষা যদিও সর্ব্বস্থলে উৎকৃষ্ট না হয় তথাপি তৎসমুদায় যন্ত্র-প্রস্তুত বলিয়া অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত এবং

স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। এক্ষণে ঐ সকল শিল্পজাতের ব্যবহার বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রবলরূপে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে এবং দেশীয় শিল্পের অযথা অনাদর হইয়া পড়িতেছে।

বাঙ্গালার আকরিকের মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা প্রধান। এদেশের অনেকানেক স্থানেই পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যাইতে পারে। যেখানে পাথুরিয়া কয়লা থাকে সেখানে লৌহও থাকে। কিন্তু এপর্য্যন্ত অধিক লৌহ এখানে প্রস্তুত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশের অনেকানেক স্থলে যথেষ্ট পরিমাণে চূর্ণ প্রস্তরও পাওয়া যায়। এবং ভগলপুর জিলার কোন কোন অংশে সীসক, রজত এবং তাম্র খনি আছে। মুঙ্গের জিলায় যথেষ্ট পরিমাণে শ্লেট প্রস্তর পাওয়া গিয়া থাকে। উড়িষ্যা এবং আসামের স্থল বিশেষে অল্প পরিমাণ স্বর্ণও পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালার বাণিজ্য এক্ষণে কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গালাদেশের এবং তন্নিবাসীদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা যাহা স্থূল স্থূল বলা হইল তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দুইটী বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য হইতে পারে। প্রথমতঃ, বিবেচনা করিতে হয় যে, বঙ্গবাসিগণের পক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে একজাতিত্ব প্রাপ্তির উপায় কি? দ্বিতীয়তঃ বিবেচনা করিতে হইবে যে বাঙ্গালার বাণিজ্য কার্য্য যাহাতে কেবল মাত্র কৃষ্যুৎপন্নের উপর নির্ভর না করিয়া শিল্পজাতের উপরে আইসে তাহার উপায় কি? এই দুইটী বিষয়ের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস পর্য্যালোচন করিলেই ইতিহাস পাঠের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। আমরা ইংরাজ রাজতার অধীন হইয়া কেমন ভাবে চালিত হইতেছি? আমরা কি আপনাদিগের ভাবি মঙ্গলগ্রাম দর্শনে যাইতেছি, না দিন দিন হীনবল, হীনবুদ্ধি, হীন অর্থ হইয়া পরিণামে প্রধ্বস্ত হইয়া যাইব এরূপ পথে পদার্পণ করিতেছি? যেমন জ্যোতিষ শাস্ত্র আকাশবিহারী গ্রহগণের কক্ষা নিরূপণ করিয়া দেয়, ইতিহাসও সেইরূপ এক একটী মনুষ্যজাতির গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবার সময় বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য, তাঁহারা আপনাদিগের ভাবি মঙ্গলামঙ্গল অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া লন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহদিগের যে পথ নির্ণীত হয়, গ্রহগণ কদাপি সে পথের কেশমিত বিপর্য্যয় করিয়া চলিতে সমর্থ নহে। কারণ গ্রহগণ জড় পদার্থ। কিন্তু ইতিহাস প্রদর্শিত পথ যদি অশুভ বলিয়া নিশ্চয় হয়, তবে পরিণামদর্শী মনুষ্য জীব আপনাদিগের চেষ্টা দ্বারা অবশ্যই সেই পথের কতক ব্যতিক্রম করিতে পারেন। যে দেশের লোকেরা ঐরূপ চেষ্টা করেন, তাঁহারাই সুসভ্য স্বাধীন এবং সজীব জাতি। যাহারা ওরূপ কোন চেষ্টা করিতে হয় জানে না, তাহারা বর্ব্বর এবং অসভ্য, যাহারা করিতে পারে না, তাহারা নির্জ্জীব, যাহাদিগকে করিতে দেয় না, তাহারা দাসবৎ পরাধীন।

কোন দেশেরই আনুপূর্ব্বিক প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালারও পাওয়া যায় না। যদি তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইত, তবে আমরা বলিতে পারিতাম অমুক সময়ে অমুক জাতীয় একটী বা তদধিক মনুষ্য পরিবার আসিয়া প্রথমে এই দেশের অমুক স্থানে বাস করে। পরে অমুক অমুক পরিবার আইসে এবং এই রূপে দেশের সর্ব্বত্র মনুষ্যদিগের বাস হয়। তাঁহাদিগের পরস্পর-সম্মিলন হয়, সমাজের বন্ধন হয় এবং শিল্পের সৃষ্টি ও সাহিত্যের অনুশীলন হয়।' পরে তাহারা এই এই অবস্থা অতিক্রম করিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান এই ভাব প্রাপ্ত হইয়া আছে। ওরূপ ইতিহাস নাই; হইতেও পারে না। বাঙ্গালার অতি পূর্ব্বাবস্থা, কি ছিল অনুমান করিতে হইলে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যায় যে ইহার নানা স্থানে নানা অসভ্য বন্যজাতীয় লোকের বাস ছিল। তাহারা কৃষি বাণিজ্য গো রক্ষাদি উৎকৃষ্ট জীবনোপায় কিছুই জানিত না। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, অকৃষ্টলব্ধ বৃক্ষাদির ফল মূল পত্রাদি খাইত, মৃগয়াও করিত। সাঁওতাল পরগণা মধ্যে এবং অন্যান্য প্রত্যন্ত দেশে যে প্রকার বন্যজাতীয় লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত বঙ্গভূমিতে সেই প্রকার লোকেরই বাস ছিল।

অনন্তর আর্য্যজাতীয় লোকেরা গঙ্গার তীরে তীরে আসিয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে উল্লিখিত আদিম অধিবাসীরা কতক বিনষ্ট কতক স্থানভ্রষ্ট কতক দাস্যে নিযুক্ত হইল। ওরূপ মিশ্রণে দেশভাষাও আর অবিকল সংস্কৃত রহিল না। সংস্কৃত-বহুল থাকিল বটে, কিন্তু অপভ্রষ্ট। উহার সহিত অনার্য্য শব্দ মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা জন্মিল। সংস্কৃত ভাষা ভাষী আর্য্য জাতীয়দিগের মধ্যে যে গ্রামীন ব্যবস্থা চির প্রচলিত ছিল উহাঁরা বাঙ্গালাতে আসিলেও যে সেই ব্যবস্থা চলিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। সেই ব্যবস্থানুসারে প্রতিগ্রাম এক একটী ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র নগরের ন্যায় হইয়া আপনার আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্য যে আপনিই সম্পাদন করিত তাহার অনেক চিহ্ন এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনুমান হয়, তখন প্রতি গ্রামেই একটী করিয়া দেবালয় এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং একজন বা তদধিক গ্রামিক মণ্ডল থাকিতেন। মণ্ডলেরা গ্রামবাসীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যাবতীয় সাধারণ প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজার রাজস্বদান, চোর ডাকাইতের শাসন, গ্রামমধ্যে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার নিবারণ ঐ মণ্ডল দিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। গ্রামবাসী দিগকে সাক্ষাৎ অন্যদীয় শাসনের অধীন হইতে হইত না। গ্রামের সন্নিহিত যে ভূমি খণ্ডে গ্রামবাসীদিগের অধিকার তাহা হইতে কতক ভূমি দেবসেবায় এবং ব্রাহ্মণের ও মণ্ডলের এবং

চৌকিদারের বৃত্তিস্বরূপ দেওয়া হইত। অবশিষ্ট ভূমি গ্রামবাসীরা পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে বিভাজিত করিয়া লইতেন। এক একটী গ্রাম এক একটী ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র অধিকারের ন্যায় হওয়াতে তাহাদিগের পরস্পর বন্ধন তেমন দৃঢ় ছিল না বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। এক ধর্ম্মাবলম্বী একজাতি সমুদ্ভূত এবং এক ভাষা ভাষী জনগণের মধ্যে যে পরস্পর মুখাপেক্ষিতা অবশ্যই থাকিবে তাহাত ছিলই, তদ্ভিন্ন আরও এক প্রকারে তাহারা পরস্পর সম্বন্ধ ছিল। সন্নিহিত গ্রাম গুলি এক একজন ভূস্বামীর বশ্যতা স্বীকার করিত এবং সেই ভূস্বামী যে জাতীয় পুরুষ তজ্জাতীয় লোকের দ্বারাই সমধিক পরিমাণে অধ্যুষিত ছিল। এখনও বাঙ্গালা দেশের বিশেষ বিশেষ ভাগে বিশেষ বিশেষ জাতির সংখ্যা অধিক এবং সেই সেই জাতির এক প্রকার প্রাধান্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। কালক্রমে এবং বিজাতীয় রাজার প্রভাবে ঐ অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ দেশের যে যে ভাগে নদী ছিল অথবা নগর কিম্বা বাণিজ্য বন্দর সমৃদ্ধ হইয়া ছিল, তথায় উল্লিখিত ব্যবস্থার চিহ্ন মাত্রও আর দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দেশের অভ্যন্তর ভাগে অদ্যাপি পূর্ব্ব ব্যবস্থার অনেকানেক চিহ্ন পাওয়া যায়। দেশ প্রচলিত জন প্রবাদ সমূহও তাহার প্রমাণ।

গ্রামাধিকারী ভূস্বামিগণ রাজতুল্য ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা গ্রামের আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্যে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। গ্রামিক শাসন গ্রামিক মণ্ডল দিগের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। ফল কথা, এই গ্রামিক শাসন ব্যবস্থাই এতদ্দেশীয়দিগের স্বাধীনতার মূল এবং সেই স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই এখানকার লোকেরা বৈদেশিক রাজার অধীন হইয়াও কখন পরাধীনতার সম্যক্ অশুভ ফল ভোগ করে নাই।

ভূস্বামিদলের মধ্যে কেহ বিশিষ্ট প্রভাবশালী হইয়া উঠিলে তিনি আপন পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ভূস্বামীদিগের প্রতি আক্রমণ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে আপনার অধীন করিয়া তাঁহাদিগের স্থানে কর গ্রহণ করিতেন। কিন্তু গ্রামিক শাসন পূর্ব্বেও যেমন ছিল পরেও তেমনি থাকিত। বিজিত ভূস্বামিগণও যে সর্ব্বস্থলে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট এবং অধিকারচ্যুত হইতেন তাহাও বোধ হয় না। অনেক স্থলে উহাঁরাও পূর্ব্বে যেমন গ্রামীনদিগের স্থানে রাজস্বাদান করিতেন পরেও সেইরূপ করিতেন। তবে আদত্ত রাজস্বের কতক অংশ বিজেতাকে প্রদান করিতেন মাত্র। কিন্তু আর্য্যবংশীয় লোকেরা একেবারে অথবা এক সময়ে আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন নাই। তাঁহারাও দলে দলে আসিয়াছিলেন এবং সুবহস্থলেই, বোধহয় সকল স্থলেই, পূর্ব্বাগত দলের উপর পরবর্ত্তী দল চাপিয়া পড়াতে অনেক উৎপাত উপস্থিত

হইয়াছিল এবং পুনঃ পুনঃ ওতপ্রোত ভাব ঘটিয়া গিয়াছিল। ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে প্রথমাগত আর্য্যদিগের সহিত দেশের আদিম নিবাসী অসভ্য লোকদিগের সমধিক সংস্রব হয়, তাহার পরবর্ত্তী দলের সহিত তদপেক্ষায় অল্প সংস্রব হয় এবং এইরূপ ন্যূনাধিক সংস্রব বশতঃ বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত বর্ণভেদ প্রণালী জন্মিয়া গিয়াছে। যাহাদিগের সহিত আদিম লোকের সংস্রব অধিক হইয়াছিল তাহারা নিকৃষ্টবর্ণতা এবং যাহাদিগের সহিত অল্প সংস্রব হইয়াছিল তাহারা উৎকৃষ্ট বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আছে। আর একটী কথাও অযৌক্তিক বোধ হয় না। আর্য্যাবর্ত্তের অপর সকল ভাগ অপেক্ষা বাঙ্গালায় স্বল্পসংখ্যক আর্য্য জাতীয় লোকের সমাগম হইয়া ছিল। এই জন্য বাঙ্গালার লোকদিগের মধ্যে প্রকৃত আর্য্যশ্রী উত্তর পশ্চিমবাসী লোকের অপেক্ষা অনেক ন্যূন—এই জন্য এখানকার নিকৃষ্ট বর্ণদিগের মধ্যেও আদিম অসভ্যলোক দিগের আকার সাদৃশ্য অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে।

তবে বিশেষ চমৎকারের বিষয় এই যে, আর্য্যাবর্ত্তের অপর সকল চলিত ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালা সাধু ভাষার সহিত মূল সংস্কৃতের নিকটতর সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে। ভাষাগত এইরূপ নৈকট্যের হেতু বিচার করিতে হইলে আমাদিগের ইহাই উপলব্ধ হয় এবং প্রাচীন ইতিহাস এবং জন প্রবাদও তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে সপ্রমাণ করে যে, বাঙ্গালার মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশিষ্টরূপ চর্চ্চা যত্ন পূর্ব্বক সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে এবং আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর ভাগে যখন তাহার অপেক্ষাকৃত অনাদর তখনও বাঙ্গালার মধ্যে উহার অনাদর হইতে পায় নাই।

প্রথিত আছে, বাঙ্গালার মহীপতি রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্যা বিশারদ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া বহু সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। সে সময়ে গৌড়-নগর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। গৌড় নগর মিথিলা প্রদেশ হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নয়। মিথিলা সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার একটী প্রসিদ্ধ সমাজ। যখন বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় হইতে সুবর্ণগ্রামে উঠিয়া আসিল তখন সুবর্ণগ্রামের অতি সন্নিহিত বিক্রমপুর প্রদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার আধিক্য হইল। অনন্তর রাজা নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলে নবদ্বীপ অতি প্রধান সমাজ হইয়া উঠিল। অতএব বাঙ্গালার অধিরাজগণ যে বিশিষ্ট যত্ন পূর্ব্বক সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করাইতেন তদ্বিষয়ে সংশয় হয় না।

কিন্তু কেবল রাজধানীতে অথবা রাজধানীর নিকটেই যে সংস্কৃতের চর্চ্চা হইত এরূপ নহে। সংস্কৃত শাস্ত্রের সুবহুল চর্চ্চার আরও অন্য উপায় ছিল, তাহা সে সময়ের সমাজবন্ধন এবং শাসন প্রণালীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই সবিশেষ প্রতীত হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গ্রামাধিকারী ভূস্বামিগণ রাজতুল্য ক্ষমতা ধারণ করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রধান সার্ব্বভৌমকে কিছু কিছু কর দিতেন; এবং যুদ্ধের সময়ে তাঁহার সহায়তা করিতে যাইতেন। কিন্তু আপনাপন অধিকার মধ্যে আপনারাই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁদিগের সভা রাজ-সভার অনুকরণে সৃষ্ট হইত। সেই সভায় সভাপণ্ডিত প্রভৃতি থাকিতেন। ভূস্বামীরা তাঁহাদিগকে বৃত্তি এবং ছাত্রবর্গের পাঠনার ব্যয় প্রদান করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা করাইতেন। বাঙ্গালার মধ্যে সংস্কৃতের আলোচনা রক্ষা হইবার ইহাই প্রধান কারণ। তদ্ভিন্ন, গ্রামমাত্রেই কিছু কিছু লেখা পড়ার চর্চা প্রচলিত ছিল। প্রতি গ্রাম একটী প্রজাতন্ত্র নগরের ন্যায় ছিল; প্রজাগণ মিলিত হইয়া মণ্ডলদিগের অধিনায়কতায় গ্রামিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সুতরাং প্রজামাত্রেরই কিছু কিছু লেখা পড়ার বোধ থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। এই জন্যই গ্রামমাত্রেই একটী করিয়া পাঠশালা ছিল এবং বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে সংস্কৃতের চতুষ্পাঠীও ছিল।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে আর্য্য এবং অনার্য্য জাতীয়দিগের মিশ্রণ এবং সেই মিশ্রণ জনিত বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি এবং বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে সংস্কৃতের বাহুল্য যে প্রকারে সংঘটিত হইয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালার ধর্ম্ম প্রণালীতেও অবিকল ঐ প্রকার মিশ্রণ এবং মিশ্রণ সত্ত্বে আর্য্যধর্ম্মের প্রাধান্য সেইরূপে সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

আর্য্যেরা বাঙ্গালা দেশে বাস করিলে পর সন্নিহিত বিহার প্রদেশে বৌদ্ধবাদ প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধবাদ বর্ণভেদ প্রথার পরম শত্রু। যে দেশে বর্ণভেদ প্রথার কঠিন সংরক্ষণে নানাপ্রকার অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তেমন দেশেই বৌদ্ধবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার সমধিক সম্ভাবনা। বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্তে অবস্থিত। আর্য্যেরা ঐ সমস্ত ভূভাগ উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করেন। সুতরাং এখানে তাঁহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প এবং আদিম নিবাসী অনার্য্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। এরূপ দেশে যে বর্ণভেদ নিবারক বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদর পূর্ব্বক পরিগৃহীত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব অনুমান হয়, অতি পূর্ব্ব কালেই বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ মত প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। এবং তজ্জন্য উচ্চ এবং নীচবর্ণের সম্মিলনসাধন হইয়া অনেক সংকর জাতি জন্মিয়াছিল। অনন্তর যখন বৌদ্ধবাদ ভারতবর্ষ হইতে নিরস্ত হইল এবং বেদমূল ধর্ম্মপ্রণালী পুনর্ব্বার সংস্থাপিত হইল তখনও বাঙ্গালার মধ্যে বৈদিক প্রথা সম্যক্ বলবান হইতে পারিল না। বৌদ্ধবাদসম্ভূত সাংখ্যদর্শনকে ভিত্তিমূল স্বরূপ করিয়া এই দেশে তান্ত্রিক প্রণালীর উদ্ভাবন হইল। এই জন্য বঙ্গীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে এবং প্রাচীন আর্য্য অনুষ্ঠানে কতক প্রভেদ অদ্যাপি লক্ষিত হইয়া থাকে।

আর্য্য বৈদিকধর্ম্মে দেবপূজার প্রাধান্য, বঙ্গীয় তান্ত্রিক ধর্ম্মে দেবীপূজার প্রাধান্য। বৈদিক প্রণালীতে যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ব্রতপালনের গৌরব, তান্ত্রিক প্রণালীতে জপ সাধনাদির মাহাত্ম্য।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈদিক প্রণালী, বাঙ্গালায় শাক্ত প্রণালী বলবৎ। এই ভিন্নতার মুখ্য কারণ অনার্য্যসংস্রব। কিন্তু অনার্য্য-সংস্রব বাহুল্যে যেমন এই প্রভেদ ঘটিয়াছে তেমনি আবার সংস্কৃত চর্চার এবং পাণ্ডিত্যের প্রভাব বশতঃ ধর্ম্মের প্রকৃতিগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটিতে পায় নাই। ইন্দ্রিয়সংযম করা এবং অন্তঃশুদ্ধি সাধন করা যেমন বৈদিক ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য, তান্ত্রিক ধর্ম্ম্য ব্যবস্থারও অবিকল তাহাই চরম উদ্দেশ্য।

মূল আর্য্যদিগের হইতে বঙ্গবাসিগণের প্রকৃতিগত কোন বৈচিত্র্য জন্মিয়াছে কি না তাহার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বাঙ্গালার চতুর্দিগ্বর্ত্তী অনার্য্য জাতীয়দিগের স্বভাবে অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণ এবং দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সকলেই আতিথেয়, আমোদ-প্রিয়, সুখাভিলাষী, কিন্তু চঞ্চল, অপরিণামদর্শী, এবং চাকচিক্য বিমুগ্ধ। অনার্য্য সংস্রবে বঙ্গবাসী আর্য্য জাতীয়গণের প্রকৃতিগত যে বৈলক্ষণ্য ঘটিবে তাহা অবশ্যই ঐ অনার্য্য জাতীয়দিগের দোষ গুণ লইয়াই হইবে। বোধ হয় তাহাই হইয়াছে। বঙ্গবাসী আর্য্য সন্তানেরা উত্তর পশ্চিম-নিবাসী আর্য্যদিগের অপেক্ষা সমধিক আমোদপ্রিয়, বিলাসী এবং চঞ্চল-প্রকৃতিক হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমের লোকেরা বাঙ্গালীদিগের হইতে সমধিক গম্ভীর এবং নিষ্ঠস্বভাব; বাঙ্গালীরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অনুকরণ-তৎপর।

বাঙ্গালা দেশ মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে ইহাতে কি কি প্রধান প্রধান পরিবর্ত্ত ঘটে তাহা বিচার করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাই দৃষ্ট হয় যে, সার্ব্বভৌমের পদ আর কোন হিন্দুর ছিল না। ঐ পদ মুসলমানের অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানের অধিকারের মধ্যে একজন হিন্দু একবার রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যে কিরূপে রাজা হইলেন তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র এই তিন পুরুষ আগরাতে রাজত্ব করেন। এবং যদিও তাঁহার পুত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অচিরে মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তথাপি হিন্দু দেব মন্দিরের জীর্ণসংস্কার এবং নূতন প্রতিষ্ঠায় বিরত হয়েন নাই। তাঁহার পুত্রও সেইরূপ করেন। ইহাতে এই অনুমান হয় যে তখনও হিন্দুরা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন নাই। মুসলমানেরা প্রবলতর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদিগেরও বিলক্ষণ প্রভাবশালিতা ছিল। হিন্দু ভূস্বামীরা যেমন পূর্ব্বে আপনাদিগের মহারাজাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর দিতেন এবং যুদ্ধকালে তাঁহার সাহায্য করিতে যাইতেন, সেইরূপ মুসলমান

নবাবেরও সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কর দিতেন এবং সাংগ্রামিক সহায়তা করিতেন। এরূপ না হইলে মুসলমান নবাবেরা বাঙ্গালার রাজধানী অধিকারের অল্পকাল মধ্যেই কখন আসাম ও উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু বোধ হয় ক্রমে ক্রমে এই ভাবের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত সংঘটিত হইতে লাগিল। মুসলমানেরা এই বিজিত ভূমিতে বাস করিলেন—সুতরাং তাঁহারা এখানকার ভূম্যধিকার হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে বহু পুরুষে কতকগুলি ভূম্যধিকার আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু তাহা করিলেও অধিকাংশ ভূম্যধিকার হিন্দু জাতীয় ভূস্বামীদিগের হস্তেই রহিল। বিশেষতঃ বাঙ্গালার যে যে স্থলে হিন্দুদিগের বাস অল্প ছিল বা ছিল না এমত সকল অস্বামিক পতিত ভূখণ্ডই মুসলমান ভূস্বামীদিগকে প্রদত্ত বা তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল বোধ হয়। তাঁহারা হিন্দু ভূস্বামী-দিগকে প্রধ্বস্ত অথবা দূরীভূত করিয়াছিলেন এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। মুসলমানদিগের অধিকার কালে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতিও কোন বিশেষ উপদ্রব বা অত্যাচার হয় নাই। মুসলমান নবাব অথবা ভূস্বামী ইঁহারা কেহই আভ্যন্তরিক শাসনের প্রণালী পরিবর্ত্ত করিবার প্রয়াস পায়েন নাই। তাঁহারা যে যাহার রাজস্ব পাইলেই নিশ্চিন্ত হইতেন। প্রজারা আপনাদিগের গ্রামিক সমস্ত কার্য্য আপনারাই নির্ব্বাহিত করিত। এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুদিগের ব্যবহার শাস্ত্র এতদিন প্রচলৎ এবং হিন্দুপ্রণালী অক্ষুণ্ণ হইয়া আছে।

মার্সমন সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে "মুসলমানেরা হিন্দু ভূস্বামিগণের স্থানে সমুদায় ভূম্যধিকার গ্রহণ করিয়াছিল। হিন্দুরা নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল, এবং মুসলমান ভূম্যধিকারিদিগের নিকট চাকুরী করিয়া দিনপাত করিত।" এ কথাগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা। হিন্দু ভূস্বামীদিগের ভূম্যধিকার প্রায়ই তাঁহাদিগের হস্ত বহির্ভূত হয় নাই। তবে মুসলমান ফৌজদারগণকে তাঁহারা কর দিতেন সুতরাং তাঁহাদিগের নিজের আয় পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছিল একথা সত্য। কিন্তু কোন কোন হিন্দু ভূস্বামী সাক্ষাৎ নবাবেরই অধীন ছিলেন এবং তাঁহাকেই কর দিতেন।

মোগলেরা পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিলে রাজস্ব আদায় এবং ভূম্যধিকার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ঘটে। মোগল বাদসাহ যাবতীয় ভূম্যধিকারী-কেই আপনার রাজস্ব আদায়ের তহসীলদার স্বরূপ জ্ঞান করেন এবং তাহাদিগকে যাহা বরতরফ করিবার ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করেন। ঐ চেষ্টা দেশ কাল পাত্র ভেদে কখন সফল এবং কখন বিফল হইয়াছিল। ফলতঃ মোগল সাম্রাজ্যের সময়ে ভূস্বামীদিগের

পূর্ব্বাপেক্ষায় খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল। রাজস্বের পরিমাণও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। যখন রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল তখন যে গ্রামীন ব্যবস্থাও আর পূর্ব্বের মত দৃঢ় সম্বন্ধ ছিল না একথা বলা বাহুল্য। ভূস্বামীদিগকে অধিক কর দিতে হইলে তাঁহারা অবশ্যই গ্রামবাসী প্রজাদিগের স্থানে অধিক রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা করিতেন এবং সেই চেষ্টা সফল করিতে হইলেই গ্রামিক মুখ্য মণ্ডল প্রভৃতির বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া অবশ্যই আপনাদিগের বল প্রকাশ করিতেন। এইরূপে গ্রামিক ব্যবস্থার ক্রমশঃ উচ্ছেদ হইয়া প্রজাবর্গ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূম্যধিকারিদিগের অধীনতায় উপস্থিত হইতে আরম্ভ হয়।

গ্রামীন ব্যবস্থা শিথিল হইবার আরও একটী কারণ মুসলমানদিগের অধিকারের প্রারম্ভ হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের গ্রামসমূহে অনেক অনার্য্য লোকের বাস ছিল। তাহারা যদিও বহুপুরুষানুক্রমে হিন্দুধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছিল তথাপি কখনই হিন্দু সমাজে সবিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই। অনুমান হয় অনেকেই গ্রামীনদিগের এক প্রকার দাসত্বে নিযুক্ত হইয়া কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। মুসলমানদিগের অধিকার কালে এই সকল লোক সহজেই পূর্ব্ব পরিগৃহীত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজধর্ম্ম গ্রহণে সম্মত হইল। ইহারা একমাত্র রাজস্বদান সম্বন্ধে গ্রামীন মণ্ডলদিগের অধীন থাকিল, অপর সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের শাসনের বহির্ভূত হইয়া গেল।

কিন্তু এই সকল কারণে গ্রামীন ব্যবস্থা হীনবল হইলেও তখনও নিতান্ত অপদার্থ হইয়া যায় নাই। অনুমান হয়, ইতরহিন্দু যাহারা মুসলমান হইত তাহারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিত না। তাহাদিগকে স্ব স্ব গ্রাম ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে বা নদীতীরে অথবা জলাকীর্ণ বিলের সন্নিধানে গিয়া বাস করিতে হইত। এখনও ঐরূপ স্থান সকলেই দেশীয় মুসলমানের বাস অধিক।

মুসলমানদিগের অধিকারের শেষাবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আর একটী ব্যাপার কথঞ্চিৎ হৃদ্গত হইতে থাকে। বোধ হয় যেন উহাঁদের সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে অবাধে বিবাহ প্রচলিত থাকায় কুবিবাহে মুসলমানেরা অনেক স্থলেই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের অপেক্ষা সমধিক হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং হিন্দুরাই ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছিলেন।

ইংরাজ অধিকারে দেশ নিরুপদ্রব হইয়াছে, সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, এবং সাময়িক পত্রে সমস্ত [illegible] সংবাদ সকলে সহজে পাইতেছে। একই ভাবের শাসন সর্ব্বত্র চলিলে, সুখ দুঃখ একই ভাবের হইলে, দেশের লোকের পরস্পরের সহিত সহজেই সহানুভূতি জন্মে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা এখন সম্বন্ধে উহাঁদেরও

মাতৃভাষা বাঙ্গালার অনুশীলন আরম্ভ করায় এবং নিম্নবর্ণের বাঙ্গালীরা উচ্চবর্ণের অনুকরণে আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কতক উন্নত হওয়ায়—বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীমাত্রের মনে একটী জাতীয় ভাব অঙ্কুরিত হইতেছে। তবে জাতীয় উন্নতি কি উপায়ে ঘটিবে তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাহারও মত এই যে, বিজেতৃদিগের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া উহাঁদের সহিত যতটা সম্ভব হয় মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করা এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা উহাঁদেরই অনুকরণে করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন অপরে বলেন, আলস্য ও স্বার্থপরতা নষ্ট করিয়া সকলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া স্বদেশবাসী অপর সকলের প্রতি নিজের মনে একাগ্রভাবে সহানুভূতির বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিলেই জাতীয় উন্নতি ঘটিবে—এবং যথোপযুক্তরূপে আচার প্রণালীও সুসংস্কৃত হইয়া যাইবে।

সংযত, মিতব্যয়ী, একাগ্রচিত্ত, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরস্পরের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন লোক যে সমাজে যত অধিক উহা সেই পরিমাণে শক্তিসম্পন্ন এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণে আভ্যন্তরিক শক্তিহীনতাই সূচিত হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধে হিন্দুর প্রকৃত উদার মতবাদের বহুল প্রচারে বাঙ্গালীর মধ্যে ধর্ম্ম বিদ্বেষের হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ সর্ব্ব শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলমানগণ যে সম্মিলিত হইতে পারিবেন উহাঁদের মধ্যে এরূপ লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু বিদেশীয় সুলভ-শিল্পজাত-প্রসূত বিলাসিতা ও বিজাতীয় মতবাদ হইতে লব্ধ ভক্তিহীনতার স্রোত স্থগিতগতি না হইলে—বাঙ্গালীর কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়া বাঙ্গালীর যেমন উন্নত হইবার যথেষ্ট আশার কারণ দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ সংযত ও সম্মিলিত হইয়া উহাঁরা সুশিক্ষার বিস্তার ও নষ্টশিল্পের উদ্ধার এবং কৃষির উন্নতি সাধন করিতে একাগ্রচিত্তে প্রবৃত্ত না হইলে জাতীয় জীবন রক্ষাই সুকঠিন হইবে।